কল্পনার নায়ক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অজয় নাগ-কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রতিশোধের একদিক
মহাপৃথিবী
এলোকেশী আশ্রম
সমুদ্রতীরে
প্রতিদ্বন্দ্বী
তাজমহলে এককাপ চা
রক্তমাংস
দুই নারী
সোনালী দিন
বন্ধুবান্ধব
প্রকাশ্য দিবালোকে
গভীর গোপন
ব্যক্তিগত
কেন্দ্রবিন্দু
দর্পণে কার মুখ
মেঘ বৃষ্টি আলো
স্বপ্ন লজ্জাহীন
শ্রেষ্ঠ গল্প
বরণীয় মানুষ : স্মরণীয় বিচার
জঙ্গলগড়ের চাবি
আকাশ দস্যু
শ্রেষ্ঠ কবিতা

সূচীপত্র

পার্টি ৯
মিথ্যে কথার প্রথম দীক্ষা ১৮
চেয়ার ২৭
সেই গাছটির নিচে ৩৬
বন্ধ জানালা ৪৪
ব্যর্থ প্রেমিক ৫৪
সূর্যকান্তর প্রশ্ন ৬৭
ভুল মানুষের গল্প ৭৮
সুধাময়ের বাবা ৮৮
নদীর মাঝখানে ৯৬
কল্পনার নায়ক ১০৮

পার্টি

সাধারণত অফিস থেকে প্রায় প্রতিদিনই সাতটা-সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরে আসে রজত, আজই তার ফিরতে ফিরতে নটা দশ বেজে গেল !

খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেল বাজাতে লাগল দরজার। শম্ভু দরজা খুলে দিতেই সে ভেতরে এসে বলল, রিনি, রিনি, তুমি তৈরি ?

টি ভি'র সামনে একটা চেয়ারে বসে আছে রিনি, হাতে একটা পত্রিকা। খুব যত্ন করে খোঁপা বাঁধা, তাতে গোঁজা একটা রঙীন ফুল, মুখে দারুণ প্রসাধন, ঠোঁটে লিপস্টিক, কিন্তু গায়ে একটা সাধারণ শাড়ি জড়ানো।

রিনি চোখ তুলে বলল, আমি তো ভাবলুম, তুমি আজ যাবে না !

রজত অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, কী মুশকিলে পড়েছিলুম তুমি জানো না। কাগজপত্র সব গুছিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, প্রায় দু'ঘণ্টা আগে, এমন সময় ম্যানেজিং ডিরেক্টার ডাকলেন। ওঁর বউ নেই, উনি তো বাড়ি যেতেই চান না। তারপর আর কথাই শেষ হয় না !

রিনি বলল, একটা ফোন করতেও পারোনি আমাকে ?

রজত বলল, ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘর থেকে ফোন করা যায় ?

রিনি বলল, আমি শাড়ি ছেড়ে ফেলেছি। আমি আর যাব না। পেঁছবার কথা ছিল সাড়ে আটটার মধ্যে, এখন যেতে যেতে দশটা বেজে যাবে না !

রজত বলল, প্লিজ আবার শাড়িটা পরে নাও। যেতে পনেরো মিনিট লাগবে। অলোকদের তুলে নিতে হবে !

রিনি বলল, তারা দু'বার ফোন করেছিল, তারা বুঝি এতক্ষণ

অপেক্ষা করে থাকবে তোমার জন্যে ? ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেছে। বিমান-তপতীও আমাকে ডেকে গেল। আমি যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না ! তুমি থাকো তোমার অফিস নিয়ে !

রিনিকে শান্ত করতে পাঁচ মিনিট লাগল। তারপর আরও সাত মিনিট সময় নিল সে শাড়ি পরতে।

রিনির রাগ হবারই কথা।

রজতের বিশেষ বন্ধু শুভজিৎ এতদিন অবিবাহিত ছিল। সে বিয়েই করবে না আর ধরে নেওয়া হয়েছিল, হঠাৎ সে এক ফিল্ম অ্যাকট্রেসকে বিয়ে করে ফেলেছে। আজ সেই উপলক্ষে বেঙ্গল ক্লাবে রিসেপশান। ফিল্মের অনেক লোকজন আসবে, নাচ-গান হবে, রিনি অনেক আগে থেকেই সেজেগুজে বসে ছিল। এতক্ষণে ওখানে কত মজা শেষ হয়ে গেল, একেবারে শেষ দিকে যাবার কোন মানে হয় ?

রজতের সাজ-পোশাকের বিশেষ কিছু বাহুল্য নেই। তার শার্টটা ঘামে ভিজে গেছে, সেটা বদলে নিল তাড়াতাড়ি, সাবান দিয়ে ধুয়ে নিল মুখ। তারপর বলল, চল, চল—

সম্পূর্ণ তৈরি হয়েও রিনি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। স্বামীর দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি বুবুনকে কিছু বলে যাবে না ?

আবার একটা অপরাধবোধের ছায়া পড়ল রজতের মুখে।

সে জিজ্ঞেস করল, বুবুন এখনও ঘুমোয় নি ?

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ঢুকে এল শোবার ঘরে। খাটে শুয়ে একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছে বুবুন। ওদের বারো বছরের ছেলে।

কাছে এসে বুবুনের কপালে হাত রাখল রজত। না, জ্বর-টর নেই। দু'দিন ধরে আর জ্বর আসেনি।

রজত জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস রে, বুবুন ?

বুবুন বলল, ভাল।

রজত আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা শুভজিৎ কাকুর পার্টিতে যাচ্ছি, তোর কোন অসুবিধে হবে না তো ?

বুবুন বলল, না।

রিনি বলল, বাইরের ঘরের আলো নেভাসনি, বুবুন। আমরা চাবি নিয়ে যাচ্ছি। আর বেশিক্ষণ বই পড়িস না। তোর শরীর এখন দুর্বল।

মা-বাবা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বুবুন জিজ্ঞেস করল, তোমরা কখন ফিরবে?

রজত বলল, এগারোটা, বড় জোর সাড়ে এগারোটা! তুই ঘুমিয়ে পড়িস কিন্তু!

জুতো পরে, বাইরের দরজাটা টেনে দিতে গিয়েও রিনি দ্বিধার সঙ্গে বলল, আমি না হয় না গেলাম আজ। বুবুন একলা থাকবে!

রজত তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, আরে চল, চল, বুবুন তো এখন বড় হয়ে গেছে!

এরপর দু'জনে তরতর করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

হ্যাঁ, বুবুন তো বড় হয়েই গেছে। বারো বছরের ছেলে, সে অনেক কিছু বোঝে। এক এক সময় সে পৃথিবী সম্পর্কে এমন খবর দেয় যে রজতেরই তাক লেগে যায়। মাকে তো সে প্রায়ই বলে, তুমি কিচ্ছু জানো না!

রজত-রিনিকে প্রায়ই নানান পার্টিতে যেতে হয়, অফিসের পার্টি, বন্ধু-বান্ধবদের পার্টি। সে সব জায়গায় রিনি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মতন উচ্ছল হয়ে যায়। অনেকেই বলে যে রিনির যে একটি বারো বছরের ছেলে আছে, তা বোঝাই যায় না। রজতও অন্যদের স্ত্রীদের সঙ্গে নাচে। মজার মজার গান গেয়ে সে জমিয়ে দেয়।

মানুষের পরিচয় বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রকম। বাড়িতে এক রকম, অফিসে এক রকম। রিনি যখন জলপাইগুড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখন সে তিনটি ভাইয়ের দিদি, রজত যখন বর্ধমানে যায় বাবার কাছে, তখন সে ছোট ছেলের মতন ধমক সহ্য করে। আবার কোন পার্টিতে গিয়ে যখন হুল্লোড়ে মেতে ওঠে, তখন ওরা দু'জন সেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে বুবুনের বাবা-মা থাকে না, তখন ওরা যৌবনময় দুই যুবক-যুবতী!

ওরা পার্টিতে গেলে বুবুন দিব্যি একা থাকতে পারে। ওদের কাজের লোক শম্ভু বসবার ঘরে শুয়ে থাকে। এবারে রিনির মনটা একটু খচখচ করছিল তার কারণ, গত সপ্তাহে বুবুন খুব জ্বরে ভুগেছে। শম্ভুর আবার মায়ের অসুখ, সে আজ রাত্তিরে থাকতে পারবে না, এর মধ্যেই সে চলে গেছে।

বুবুন কিছুক্ষণ বই পড়ার পর বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। বই পড়তে আর ইচ্ছে করছে না, ঘুমও আসছে না। সে খাট থেকে নেমে এল।

তার ঘর আলাদা, বাবা-মায়ের ঘর আলাদা। তবে তার জ্বরের জন্যে এই ক'দিন মা তার পাশে এসে শুচ্ছিল। বিছানাটা আজ কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগছে বুবুনের। ফ্ল্যাটটাও যেন বড় বেশি নিস্তব্ধ!

বসবার ঘরে এসে সে টি ভি চালিয়ে দিল। চ্যানেল বদলাতে লাগল পর পর। কোন প্রোগ্রামই তার পছন্দ হচ্ছে না।

ফ্রিজটা খুলে ফেলল অন্য ঘরে এসে। তার খিদে পায়নি, এখনও তার ভাল করে খিদে হচ্ছে না, তবু সে ফ্রিজের বিভিন্ন পাত্রের ঢাকনা খুলে খুলে দেখল কী কী আছে। একটা স্টিলের কৌটোয় রয়েছে সন্দেশ। একখানা সন্দেশ নিয়ে কিছুটা কামড়ে খেয়ে বাকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দা দিয়ে রাস্তায়।

রান্নাঘরে গিয়ে এটা সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে আলমারিতে পেয়ে গেল একটা বাদামের টিন। সেটা খুলতে গিয়ে বেশ কিছু বাদাম ছড়িয়ে গেল মেঝেতে। পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সে বাদামগুলো সরিয়ে দিল এক পাশে। না, তার বাদাম খেতেও ইচ্ছে করছে না।

আবার বিছানায় ফিরে এসে শুয়ে পড়তেই ঘুম এসে গেল তার।

খানিক বাদেই আবার তার ঘুম ভেঙে গেল কেন? অন্য ঘরে কারা যেন কথা বলছে। মা-বাবা ফিরে এসেছেন তাহলে?

খাট থেকে নেমে কয়েক পা যেতেই বুবুন বুঝতে পারল, এ ফ্ল্যাটে সে এখনো একা, টি ভি বন্ধ করা হয়নি, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে সেখানে।

ঘড়িতে এগারোটা চল্লিশ বাজে। বাবা সাড়ে এগারোটার মধ্যে

ফিরবেন বলেছিলেন। কোন পার্টি থেকেই ওঁরা একটা-দেড়টার আগে ফেরেন না। বাড়ি থেকে বেরুলেনই তো প্রায় দশটার সময়।

বুবুন এসে বারান্দায় দাঁড়াল। একটা ডোরাকাটা পা-জামার ওপর গেঞ্জি পরা। অন্ধকার, নির্জন রাস্তা। রাত্তিরবেলা রাস্তাটা বেশি চওড়া দেখায়। বুবুনের একটু শীত শীত করছে। আবার জ্বর আসবে নাকি?

হঠাৎ রাস্তার উল্টো দিকে একটা কোনাকুনি বাড়ির বারান্দার দিকে তার চোখ গেল। অন্য সব বাড়িতে আলো নিভে গেছে, শুধু ঐ বাড়িতে আলো জ্বলছে দোতলায় একটা ঘরে। বারান্দায় কে দাঁড়িয়ে আছে, শুভম না? হ্যাঁ, বুবুনের বন্ধু শুভমই তো। সে হাত নেড়ে কী যেন বলতে চাইছে। এত রাতে চেঁচিয়ে কথা বলা যায় না। অত দূর থেকে শোনাও যাবে না। এতবার হাত নাড়ছে কেন শুভম?

বুবুন চট করে ভেতরে গিয়ে শুভমদের বাড়ির টেলিফোনের নম্বর ঘোরাল।

শুভমের গলা পেতেই সে বলল, বোকারাম, পুতুলের মতন হাত নাড়ছিলি কেন? কী বলছিলি?

শুভম বলল, ঘুম আসছে না, তাই তোকে ডাকছি! তোর বাবা-মা বেঙ্গল ক্লাবের পার্টিতে গেছে না?

বুবুন বলল, হ্যাঁ। শুভজিৎ কাকার বিয়ে।

শুভম বলল, আলুর দম মার্কা একটা সিনেমার মেয়ের সঙ্গে। একদম নাচতে জানে না, তবু ধেই ধেই করে নাচে! 'বালুচর' নামে একটা ফিল্মে খালি তিড়িং তিড়িং করে নেচেছে।

তুই বাংলা ফিল্ম দেখিস?

বয়ে গেছে দেখতে! বিচ্ছিরি, বাজে। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা-গুলো ছাড়া। একদিন টেলিভিশানে ঐ ছবিটা হচ্ছিল, মা বলল, এই মেয়েটার সঙ্গে শুভজিতের বিয়ে। তাই দেখলাম খানিকটা। এই বুবুন, আমি তোদের বাড়িতে চলে আসব?

এখন? কী করে আসবি?

পিসি ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাদের দারোয়ানটাও ঘুমোয়।

চুপিচুপি বেরিয়ে আসতে পারি। তোদের তো ফ্ল্যাট বাড়ি, গেট খোলা, কোন অসুবিধে নেই। ওঁদের ফিরতে অনেক দেরি, আমার একা একা ভাল লাগছে না।

তা হলে চলে আয়!

বুবুন দরজাটা খুলে রাখল, দু'তিন মিনিটের মধ্যে চলে এল শুভম। তার হাতে একটা চকলেট বার।

আধখানা ভেঙে দিয়ে সে বলল, আর কাকে কাকে ডাকা যায় বল তো? অনন্যকে ডাকবি?

বুবুন বলল, অনন্য পার্ক সার্কাসে থাকে। অতদূর থেকে আসবে কী করে?

শুভম বলল, টেলিফোনে গল্প করি। ওর বাবা-মাও বেঙ্গল ক্লাবে গেছে আমি জানি।

অনন্যকে টেলিফোন করা হল। কেউ ধরছে না। অনন্য ঘুম-কাতুরে, নিশ্চয়ই অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

শুভম একটু চিন্তা করে বলল, তোদের এই বাড়িতেই তো মিষ্টুনি-দুষ্টুনি থাকে। ওরা জেগে থাকতে পারে।

বুবুন বলল, ওদের বাবা-মাও বাড়িতে নেই? তুই কী করে জানলি?

শুভম বলল, আমাদের বাড়িতে বসেই তো কথা হচ্ছিল কাকে কাকে নেমন্তন্ন করা হবে। আমি তখন শুনেছি।

বুবুন বলল, মিষ্টুনির সঙ্গে আমার ঝগড়া। তুই ডেকে দ্যাখ।

মিষ্টুনিরা তিন বোন, তার মধ্যে মিষ্টুনি-দুষ্টুনি পিঠোপিঠি, একজনের বয়েস চোদ্দ, আরেকজনের বারো, ছোট বোন টিনটিনির বয়েস আট। ওদের বাবা-মায়ের খুব সুবিধে, বেশি রাত করে পার্টিতে থাকলেও তিন বোন এক সঙ্গে থাকবে, কেউ ভয় পাবে না।

শুভম ফোন করতেই মিষ্টুনি ধরল।

বুবুন বলল, তিনতলায় বুবুনদের ঘরে চলে আয় না। আমরা ভি সি আর-এ একটা ভূতের ছবি দেখাব।

মিষ্টুনি বলল, ভ্যাট্! এত রাতে আমি ফিল্ম দেখি না। ভূতের ছবি আমার একেবারেই ভাল লাগে না।

শুভম বলল, তাহলে একটা অ্যাডাল্ট ছবি দেখব। বুবুনের বাবা একটা ক্যাসেট এনেছেন।

মিষ্টুনি বলল, গাঁট্টা খাবি। আমার সঙ্গে অসভ্যতা হচ্ছে? আমি তোর থেকে বড় না? আমি যাব না এখন, বিরক্ত করিস না।

দুষ্টুনিও জেগে আছে। সে পাশ থেকে শুনে ফেলে বলল, আমি যাব, আমি যাব!

দুষ্টুনি বয়েসে ছোট হলেও তাকে সামলাবার সাধ্য নেই মিষ্টুনির। সে সাঙ্ঘাতিক জেদী। অগত্যা মিষ্টুনিকেও আসতে হল।

বুবুনদের ফ্ল্যাটে ঢুকে মিষ্টুনি বলল, আমরা বেশিক্ষণ থাকব না, অ্যাডাল্ট ছবিও দেখব না।

দুষ্টুনি বলল, সিনেমা-ফিনেমা বাজে। আয় নাচবি। বাবা-মাও তো এখন পার্টিতে নাচছে।

বুবুন দেওয়াল আলমারি থেকে একটা বোতল বার করল।

মিষ্টুনি বলল, ওমা, ওটা কি?

বুবুন বলল, ভোদকা। এখন পার্টি হবে তো। আমরা সবাই ভোদকা খাব।

মিষ্টুনি শিউরে উঠে বলল, মদ! এই পাজি ছেলে, রেখে দে। তোর বাবার জিনিসে হাত দিচ্ছিস কেন রে?

শুভম বলল, মদ বলতে নেই। ড্রিংক্স। সেটা ভাল শোনায়। পার্টিতে ড্রিংক করতে হয়।

দুষ্টুনি বলল, আমি খাব, আমি খাব?

মিষ্টুনি বলল, খবরদার। মদ খেলে মুখে গন্ধ হবে।

দুষ্টুনি ঠোঁট উল্টে বলল, রাত্তিরবেলা কে গন্ধ শুঁকতে আসবে?

শুভম বলল, বাবা-মায়েরা নিজেরা অনেক গিলে আসবে, আমাদের গন্ধ পাবেই না।

দুষ্টুনি বলল, আর কাকে কাকে ডাকা যায় বল তো? মাত্র চারজনে পার্টি হবে?

আরও কয়েকটা নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা হল। কিন্তু কেউ

কাছাকাছি থাকে না। যাদের বাবা-মা বাড়িতে আছে, তারাই বা এত রাতে আসবে কী করে?

বুবুন চারটে গেলাস নিয়ে তাতে অনেকখানি সোডা ঢালল। তারপর একটু একটু করে ভোদকা মেলাল।

অন্যদের দিকে বাকি গেলাসগুলো ঠেলে দিয়ে নিজেরটা তুলে নিয়ে সে বলল, চিয়ার্স!

মিষ্টুনি গেলাস তুলল না। মুখ গোঁজ করে বলল, আমি ও সব খাব না। যদি নেশা হয়ে যায়!

দুষ্টুনি এক চুমুকে নিজেরটা শেষ করে দিয়ে বলল, এই দ্যাখ দিদি, আমার কিছু হল না!

শুভম মিষ্টুনিকে চেপে ধরে বলল, তোকে খেতেই হবে। বুবুন, গেলাসটা ওর মুখের কাছে ধরতো।

মিষ্টুনি ছটফট করছে আর দুষ্টুনি খিল খিল করে হাসছে। নিজেই তার গেলাসে আর একটু ঢেলে নিল ভোদকা।

আলমারি থেকে একটা চুরুটের বাক্স বার করে বুবুন একটা চুরুট ধরাল।

মিষ্টুনি তার গেলাসে একটা চুমুক দিতে বাধ্য হয়েছে। এবার সে চোখ বড় বড় করে বলল, ও মা, তুই চুরুটও খাচ্ছিস?

বুবুন বলল, বেশ করব।

দুষ্টুনি বলল, দেতো, দেতো আমি একটু টেনে দেখব।

দুবার চুরুটে টান দিয়ে সে খক খক করে কাশল। তারপর সেটা বুবুনকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, ধ্যাৎ, বাজে!

শুভম বলল, শুভজিৎ কাকুর সঙ্গে যে মেয়েটার বিয়ে হয়েছে, সে তো নাচে। তার সঙ্গে শুভজিৎ কাকুও নাচবে নিশ্চয়ই। আমাদের বাড়িতে একটা পার্টি হয়েছিল, তাতে শুভজিৎ কাকু কী রকম নেচেছিল দেখবি?

শুভমের নাচ দেখে বুবুন আর দুষ্টুনি হেসে কুটি কুটি।

তারপর বুবুন বলল, আমার বাবাও একদম নাচতে জানে না। তবু নাচা চাই। বাবা এই রকম নাচে—

সারা শরীর মুচড়িয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল বুবুন। এবার

মিষ্টুনিও না নেচে পারল না।

এদের মধ্যে সত্যিকারের নাচতে জানে মিষ্টুনি। সে নাচ শেখে। পশ্চিমী নাচও সে পারে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওরকম বিচ্ছিরি নাচতে হবে না। আয় আমরা নিজেরা নাচি।

মিষ্টুনি ধরল শুভমের হাত। বুবুন ডেকে নিল দুষ্টুনিকে। তারপর ওরা সারা ঘর ঘুরতে লাগল।

রাত প্রায় পৌনে একটা। রাস্তায় কোন গাড়ির শব্দ নেই। বাবা-মা হঠাৎ ফিরে আসবেন কি না, সে ব্যাপারেও ওদের যেন মাথা ব্যথা নেই। জমে উঠেছে চারজনের পার্টি। নাচের সঙ্গে সঙ্গে অনবরত হাসি। নিচু গলায় গান গাইছে দুষ্টুনি। ভোদকার বোতল প্রায় অর্ধেক শেষ, তাতে জল মিশিয়ে আবার ভরে রাখল বুবুন। অ্যাসট্রে-তে জ্বলন্ত চুরুটটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এক সময় দুষ্টুনি গেল বাথরুমের দিকে। মিষ্টুনি আর শুভম পরস্পরকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে নেচেই চলেছে। ঘোর এসেছে মিষ্টুনির, তার চক্ষু বোজা।

বাথরুমের আলো জেলে দেবার জন্যে তার সঙ্গে এল বুবুন। কিন্তু আলো না জেলে সে হঠাৎ দুষ্টুনিকে জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াতে গেল।

তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিল দুষ্টুনি। তার মুখখানা রক্তাভ হয়ে গেছে। সে ফ্যাকাসে গলায় বলল, এই এই, এ কী হচ্ছে?

বুবুন বলল, একদিন আমার বাবা তোর মাকে এখানে লুকিয়ে আদর করছিল, আমি দেখে ফেলেছিলাম!

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দুষ্টুনি বলল, মোটেই না, মোটেই না, তুই ভুল দেখেছিস। আমার মা খুব ভাল, মা খুব ভাল।

বুবুনের মুখখানা যে বয়স্কদের মতন হয়ে গেছে এখন। তার বাবার মতন। গম্ভীর ভাবে সে বলল, আমিই কি খারাপ? মোটেই খারাপ নয় আমি।

তারপর সে জোর করে বুকে টেনে নিল দুষ্টুনিকে।

মিথ্যে কথার প্রথম দীক্ষা

পুনর্জন্ম কিংবা জাতিস্মরের ব্যাপারে বিশ্বাস নেই প্রণবের, তবু নিজের ছেলেকে দেখেই তার খটকা লাগে। মাত্র ছ বছর এক মাস বয়েস রিণ্টুর। এমনিতে ওই বয়েসের ছেলেদের মতনই স্বাভাবিক। ছোটাছুটি করে খেলে, অর্ধেক খাবার ফেলে উঠে যায়, গুপী গায়েন বাঘা বায়েনের গান সারা দিনে দশ-বারো বার শোনে, লুকিয়ে বাবার হাতঘড়ি পরে, কাচের গেলাস ভেঙে তাতেই আবার পা কাটে, ভূতের গল্প শুনলে মায়ের পাশ থেকে নড়ে না, ফ্রিজ খুলে কণ্ডেন্সড মিল্ক খায়। এই সবই ঠিক আছে। প্রণব নিজের শৈশবের কথা মনে করার চেষ্টা করে। ছ'বছর বয়েসের স্মৃতি বড় জোর দু-এক ঠুকরো, তবু সে বুঝতে পারে, রিণ্টুর বয়েসে সেও নিশ্চয়ই ওই রকমই ছিল।

কিন্তু মাঝে মাঝে রিণ্টুর দু-একটা কথা শুনলে তার পিলে চমকে যায়।

রিণ্টু খুব একটা দুষ্টুও নয়, আবার তেমন শান্তশিষ্টও নয়। তবে, হঠাৎ হঠাৎ সে উৎকট গম্ভীর হয়ে যায়, ফুলে ওঠে গোলাপি রঙা গাল দুটো, চোখ দুটো স্থির করে দুমদাম প্রশ্ন করে বাবাকে।

—বাবা, বলো তো, নেপচুন দেবতার আর দুই ভাইয়ের নাম কী?

—বাবা, তুমি জানো, নিউ ক্যাস্‌ল শহরে কটা ব্রিজ আছে?

—পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি কোন্‌টা?

—জানো তো, পৃথিবীতে পনের হাজার রকমের অর্কিড আছে?

—আমাদের সূর্য দেবতা আর গ্রিকদের কোন্ দেবতা একই?

প্রণব নিজেই এর অনেকগুলোর উত্তর জানে না। রিণ্টু খানিকবাদে উত্তর বলে দেয়। ও এসব জানল কী করে?

অনেক জেনারেল নলেজের বইতে এই ধরনের সব প্রশ্ন থাকে। টিভি-তে মাঝখানে কুইজ প্রতিযোগিতা চালু হয়েছিল। খুব শক্ত শক্ত প্রশ্ন থাকত। সে সব তো রিণ্টুর বয়েসীদের জন্য নয়। যদি বা রিণ্টু টিভি'র সেরকম অনুষ্ঠান দেখেও থাকে, মনে রাখবে কী করে? শুধু একবার শুনলে মনে রাখা সম্ভব? রিণ্টুর কাছে সেরকম কোনও জেনারেল নলেজের বইও নেই, সে সবেমাত্র বড় বড় অক্ষরে ছাপা ইংরেজি বই পড়তে শিখেছে। সুকুমার রায়ের তিনখানা বই ছাড়া আর কোনও বাংলা বইও নেই।

জয়ন্তীর ধারণা হয়ে গেছে, তাদের ছেলে একটি জিনিয়াস। প্রণব তাকে সাবধান করে দেয়। স্ত্রীকে সে গম্ভীর গলায় বলে, দেখো, অনেক বাবা-মা'ই নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আদিখ্যেতা করে। বাইরের লোকদের সামনে যেন এসব বলতে যেও না। নীপাবৌদির মতন লোকজনকে ডেকে ছেলেমেয়েদের ওপর অত্যাচার করা আবৃত্তি করে শোনাও তো, ওই গানটা গাও — বিশ্রী ব্যাপার, লোকে হাসে। আজকালকার বাচ্চারা অনেক চালু, ওরা অনেক কিছুই অল্প বয়েসে জেনে যায়।

তবু প্রণবের মনের মধ্যে একটা খটকা থেকেই যায়। রিণ্টুর কাছে অন্য যে বাচ্চারা খেলতে আসে তারা এত জানে না। প্রণব আড়াল থেকে শুনেছে, সমবয়সীদের কাছেও রিণ্টু হঠাৎ হঠাৎ এই সব প্রশ্ন করে বসে, তারা উত্তর দিতে পারে না।

কোথায় শিখল, কী করে শিখল? প্রণব নিজেই পড়ায় রিণ্টুকে। পাড়ার চেরি ব্লসম নামে একটা উটকো ইস্কুলে রিণ্টুকে ভর্তি করা হয়েছে, জয়ন্তীর দিদির মেয়ে বাপ্পাও পড়ে সেখানে, বাপ্পা তো এসব জানে না!

প্রণব একদিন রিণ্টুকে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, হ্যাঁরে, তুই যে বললি, নিউ ক্যাসলে সাতটা ব্রিজ, সেগুলো কোন নদীর ওপর তুই জানিস?

রিণ্টু সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, রিভার টাইন।

—নিউ ক্যাসল শহরটা কী জন্য বিখ্যাত তা জানিস?

—কয়লা! কত কয়লা! ওই জন্য নিউ ক্যাসলে কয়লা নিয়ে

যেতে নেই।

প্রণব ভেতরে ভেতরে শিউরে ওঠে। এমনভাবে বলছে রিণ্টু, যেন সে আগের জন্মে নিউ ক্যাসলে ছিল!

রিণ্টুকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে প্রণব জিজ্ঞেস করে, তুই এসব জানলি কী করে রে?

দু'দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে রিণ্টু বলে, জানি! তুমি জানো না আমি জানি!

সত্যিই, প্রণব তার সাঁইত্রিশ বছরের জীবনে যা জানে না, একটা ছ'বছরের বাচ্চা তা জেনে যায় কী করে? এটা একটা রহস্য নয়!

জিনিয়াস হোক বা না হোক, ছেলের যে স্মৃতিশক্তি সাংঘাতিক, তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজের দিদির বাড়ির টেলিফোন নাম্বার ভুলে যায় জয়ন্তী। রিণ্টু মাকে মনে করিয়ে দেয়। আরও বহু টেলিফোন নাম্বার তার মুখস্থ। 'আবোল-তাবোল'-এর প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা। পরীক্ষা করার জন্য একদিন প্রণব রিণ্টুকে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের এক পাতা পড়ে শুনিয়েছিল। দু'তিনবার শোনবার পর রিণ্টু মানে না বুঝেও শক্ত শক্ত লাইনগুলো প্রায় ঠিক বলতে পারে।

পাড়ার স্কুলটায় ছ'বছর বয়েসে পর্যন্ত বাচ্চারা পড়ে, এবার রিণ্টুকে বড় স্কুলে দিতে হবে। রাত জেগে লাইন দিয়ে সেণ্ট জেভিয়াস', সেণ্ট লরেন্স, ডন বসকো, সাউথ পয়েণ্ট, বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলের ভর্তির ফর্ম এনেছে। বলাই বাহুল্য, প্রত্যেকটি স্কুলের পরীক্ষাতেই রিণ্টু প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পেয়েছে। যে-কোনও স্কুলে তাকে ভর্তি করা যেতে পারে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেরই পছন্দ সেণ্ট জেভিয়াস'। প্রণব তো প্রথম থেকেই সেটা চায়। তার নিজের জীবনের দু'একটা ব্যর্থতাবোধ রয়ে গেছে। সে নিজেও স্কুল জীবনে পড়াশুনোয় খারাপ ছিল না। প্রেসিডেন্সি কিংবা সেণ্ট জেভিয়াস' কলেজে তার পড়ার খুব শখ ছিল। কিন্তু তার বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না মোটেই। সিটি কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে খানিকটা আলাপ থাকার সূত্রে, হাফ ফ্রি পাওয়ার আশায় বাবা

তাকে জোর করে সিটি কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বন্ধুরা গর্বের সঙ্গে এখনও প্রেসিডেন্সি বা সেন্ট জেভিয়াস কলেজের স্মৃতি রোমন্থন করে, প্রণব তখন চুপ করে বসে থাকে।

প্রণব আই এ এস পরীক্ষা দিয়েছিল দু বার। একটুর জন্য দু'বারই ফস্কে গেছে। ইংরেজিতে বেশি নম্বর ওঠেনি। প্রণবের ধারণা, এই ব্যর্থতার জন্যও সিটি কলেজে পড়াটাই দায়ী। প্রেসিডেন্সি, সেন্ট জেভিয়াসের ছেলেরা অনায়াসে আই এ এসের তালিকার ওপর দিকে স্থান পায়। শেষ পর্যন্ত প্রণব ডব্লু বি সি এস পাস করেছিল। সারা জীবন তাকে মেজো অফিসার হয়ে থাকতে হবে, কোনওদিন বড় অফিসার হতে পারবে না।

ছেলেকে দিয়ে সে তার ক্ষোভ মেটাবে। রিন্টু আই এ এসে ফার্স্ট হবে নির্ঘাত। সেন্ট জেভিয়াস স্কুল থেকে একটা চিঠি এল, আগামী সোমবার রিন্টুকে নিয়ে তার বাবা-মা দু'জনকেই যেতে হবে বিকেল চারটের সময়। বাবা-মা'র ইন্টারভিউ!

জয়ন্তীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তাকেও যেতে হবে! সাহেব পাদ্রীরা এ স্কুল চালায়, তাদের সামনে গিয়ে কথা বলতে হবে ইংরেজিতে?

ছেলের ভর্তির জন্য বাবা-মাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে কেন? যদি বাবার আর্থিক অবস্থা জানতে হয়, তাহলে শুধু বাবাকে ডাকলেই তো চলে, মাকেও ডাকার কী দরকার! এ অন্যায়, ভারি অন্যায়, জয়ন্তী ছটফটিয়ে বারবার বলতে লাগল এই কথা। বাংলা অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে জয়ন্তী, ইংরেজিতে কথা বলার একেবারেই অভ্যেস নেই! ইংরেজি পড়লে বোঝে, কিন্তু ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়ে অনেক সংলাপই বুঝতে পারে না।

প্রণব অনেক ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল। অত ভয়ের কী আছে? গত বছর ম্যাড্রাসে গিয়ে তুমি দোকানদারদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে ইংরেজি বলোনি? অবাঙালি কেউ যখন ফোন করে, তুমি ধরলে উত্তর দাও না?

জয়ন্তী বলল, সেই বলা, আর সাহেবদের সামনে বসে বলা? ওরে বাবা, আমি কিছুতেই পারব না। দরকার নেই সেন্ট

জেভিয়ার্স, তুমি রিণ্টুকে সেণ্ট লরেন্সেই ভর্তি করে দাও !

এই উপলক্ষে স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। জয়ন্তীর এই অনর্থক দুর্বলতার জন্য রিণ্টুর উজ্জ্বল ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে যাবে? সেণ্ট জেভিয়ার্সে সুযোগ পেলেও কেউ অন্য স্কুলে যায়?

জয়ন্তী এর মধ্যেই অন্য অনেকের কাছে খবর নিয়েছে। শুধু বাবার সঙ্গে মাকে হাজিরা দিলেই হবে না। মাকেও অনেক প্রশ্ন করে সাহেবরা, গত বছর বাবা-মা ইণ্টারভিউতে ফেল করায় সাতটি ছাত্রকে ভর্তি করাই হয়নি। অবশ্য অনেক টাকা ডোনেশন দিলে নাকি ইণ্টারভিউ লাগে না।

জয়ন্তী বললো, আমরা শুধু যেচে ফেল করতে যাব কেন? তাতে রিণ্টুর মনে লাগবে না? আমরা তিরিশ হাজার টাকাও দিতে পারব না? সেন্ট লরেন্সই ভাল, ওরা এক্ষুণি ভর্তি করে নেবে!

প্রণব চোয়াল শক্ত করে বলল, তোমরা যা খুশি কর। তা হলে সারা জীবনে আর রিণ্টুর পড়াশুনো নিয়ে কোনও কথা বলতে এসো না আমাকে।

জয়ন্তী বলল, ভাল ছেলে যদি হয়, যে-কোনও ইস্কুলেই পড়ুক...

প্রণবের আসল বেদনাটা যে কোথায় তা জয়ন্তীও জানে। একটু পরে তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি আসে। স্বামীর কাছ ঘেঁষে এসে বলল, তুমি বরং মিলিকে সাজিয়ে নিয়ে যাও!

প্রণব ভুরু কুঁচকে বলল, মিলিকে নিয়ে যাবো!

জয়ন্তী বলল, হ্যাঁ, সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে। সাহেবরা কি আমাকে চেনে নাকি?

জয়ন্তীর ছোট বোন মিলি যদিও বাংলা স্কুল-কলেজেই পড়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর গত সাত বছর ধরে আছে ইংল্যাণ্ডে, এখন ফরফর করে কায়দার ইংরেজি বলতে পারে। চেহারাটাও অনেক বদলে গেছে মিলির। সিঁদুর-টিঁদুর পরে না, হাতে লোহা নেই, সুন্দর করে চুল ছাঁটা। জামাইবাবুর সঙ্গে তার বেশ ভাব, জয়ন্তীর চেয়ে মাত্র দু'বছরের ছোট, প্রণবের পাশে বেশ মানিয়ে যাবে। কেউ সন্দেহ করবে না।

টেলিফোনে মিলিকে প্রস্তাবটা পাড়তেই সে দারুণ উৎফুল্ল ভাবে রাজি হয়ে গেল। অভিনয় করতে কার না ভাল লাগে? সে মাত্র একমাসের জন্য দেশে বেড়াতে এসেছে, এর মধ্যে দিদির যদি একটা এরকম উপকার করে যেতে পারে, তার চেয়ে আনন্দের আর কী আছে? রিণ্টুর মতন হীরের টুকরো ছেলে, সে অবশ্যই পড়বে সবচেয়ে ভাল স্কুলে।

প্রণব বুঝল, মিলিকে সঙ্গে নিয়ে গেলে সমস্যাটা খুব সহজ সমাধান হয়ে যাবে। শুধু একটাই কাঁটা বিঁধে থাকবে মনে। রিণ্টুকে মিথ্যে কথা শেখাতে হবে। সাহেবদের সামনে মাসিকে সে মা বলবে। রিণ্টুর শিক্ষা শুরু হবে একটা মিথ্যে দিয়ে, যে মিথ্যে শেখাবে তার মা আর বাবা। এর পরে রিণ্টু আরও মিথ্যে বলা আরম্ভ করলে তাকে শাসন করা যাবে কোন মুখে?

অতশত ভাবলে চলে না। যা দিনকাল পড়েছে, বাঁচতে গেলে আরও অনেক মিথ্যে শিখতেই হবে রিণ্টুকে। এখন থেকেই তৈরি হওয়া ভাল। শুধু মাসিকে মা বলাই নয়, কেন এই মিথ্যের আশ্রয় নেওয়া, সেটাও বুঝিয়ে দিতে হবে ওকে। যারা তিরিশ হাজার টাকা ডোনেশন দেয়, তাদের এরকম কারসাজির দরকার হয় না। কিন্তু তিরিশ হাজার টাকাটাও কি বিরাট মিথ্যে নয়?

এত বেশি সেজে এসেছে মিলি যে তা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে যায়। বিলেতের মেয়েরা যখন স্কুলে পেরেণ্ট হিসেবে যায় আর পার্টিতে যায়, তখন কি একই রকম সাজগোজ করে। প্রণব বলল, তোমার সঙ্গে যে আমায় একেবারেই মানাচ্ছে না, মনে হবে আমি বাড়ির চাকর!

মিলি ভ্রূভঙ্গি করে বলল, আ-হা-হা! আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়, আপনি রাইটার্স বিল্ডিংসের বড় কেরানি। একটা জ্যাকেট পরুন আপনার টাই নেই? জানলে আমি নিয়ে আসতাম।

প্রণব বলল, আমি টাই পরি না। নিজের চাকরির ইণ্টারভিউতেও টাই পরিনি!

রিণ্টু হাফ প্যাণ্ট, হাফ শার্ট, জুতো পরে তৈরি। পাড়ার স্কুল ওকে খানিকটা ইংরেজি বলতেও শিখিয়েছে। যে-সব

সাহেবরা ইণ্টারভিউ নেবে, রিণ্টু আবার তাদেরই কোনও শক্ত প্রশ্ন না করে বসে। পৃথিবীতে কতরকমের অর্কিড আছে কিংবা নেপচুনের ভাইদের নাম কি সব সাহেব জানে?

রিণ্টুর কাঁধ চাপড়ে প্রণব বলল, তুই নিজে থেকে কিছু বলবি না, তোকে যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার উত্তর দিবি, মনে থাকবে তো রিণ্ট?

ট্যাক্সিটা থামল সেণ্ট জেভিয়াস' স্কুলের উল্টোদিকে ফুটপাতে। চারটে বাজতে এখনও বারো মিনিট বাকি আছে। ভাড়া মেটাতে মেটাতে ট্যাক্সির মধ্যে বসেই রিণ্টুর সঙ্গে কথাগুলো আবার ঝালিয়ে নিল। মিলি মাসি না, শী ইজ মাই মাদার। প্রশ্নের উত্তরে শুধু ইয়েস কিংবা নো বলতে নেই, বলতে হয় ইয়েস স্যার, নো স্যার…

ট্যাক্সি থেকে নামতেই মুখোমুখি একজনের সঙ্গে দেখা। খাঁকি প্যাণ্টের ওপর নীল শার্ট পরা, মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। একটা সিগারেট মুঠোর মধ্যে ধরে কল্কের মতন হুস হুস করে টানছে।

—স্যার নমস্কার, নমস্কার!

এর নাম বিষ্টু, পদবিটা জানা নেই, বাজারে মাছ বিক্রি করে। হাসি খুশি মানুষটি, প্রণবকে কখনও ঠকায়নি, নানান গল্পও করে, প্রণবের কাছে কোনও দিন টাকা কম থাকলেও জোর করে দামি মাছ দেয়।

প্রণব কিছু বলার আগেই বিষ্টু আবার বলল, আপনার ছেলেকে এখানে ভর্তি করছেন? আমার ছেলেটাও…বললে বিশ্বাস করবেন না স্যার, আমি তো ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছি, আমার বউও ক্লাস টু, কী করে আমাদের ফ্যামিলিতে এমন ছেলে জন্মাল, এমন সব কথা বলে, আমরা বাপের জন্মে শুনিনি! পাড়ার ইস্কুলে দিয়েছিলুম, সেখানকার দিদিমণি বলল, এ ছেলেকে ভালভাবে লেখাপড়া শেখালে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে…অবশ্য গুপী, মানে আমার শালা, যে লেখাপড়া জানে, সে ছেলেটাকে মন দিয়ে পড়িয়েছে, সেণ্ট জেভিয়াসে চান্স পেয়ে গেল…

প্রণব বলল, বাঃ খুব ভাল তো! খুব খুশি হলাম!

বিষ্টু বলল, ভগবানের আশীর্বাদে স্যার···ছেলেটা যদি সত্যি মানুষ হয়···কিন্তু আমাদের তো কপাল! বলে কি না, বাবা আর মাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে। দেখুন দিদি, কী গেরো! আমি ইংলিশ জানি না, আর আমার বউ তো···আমার শালার মোটে কুড়ি বছর বয়েস, সেও তো আমার বদলে আসতে পারে না। শেষকালে ভাগ্যিস ভাড়া পেয়ে গেলাম!

প্রণব বলল, ভাড়া?

বিষ্টু বলল, মানে ভাড়া ঠিক নয়, রণেনবাবুকে চেনেন তো, ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করেন, ওঁর বউই তো আমাদের পাড়ার ইস্কুলের মাস্টারনী, ওদের বললুম, আপনারা যদি দয়া করে··· ইলেকশানের সময় কতই তো ফলস ভোট হয়, কত্তা গিন্নি একটু বেলা করে ভোট দিতে গেল, ওমা আর কেউ আগেই সেজে এসে সেই নামে ভোট দিয়ে গেছে। হয় না এরকম? রণেনবাবু আর দিদিমণিকে বললুম, আপনারাও যদি আমাদের হয়ে ফলস ইন্টারভিউটা···ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে ভেতরে পাঠিয়েছি, বুঝলেন স্যার, যদি পাস করে বেরিয়ে আসে, কেল্লা ফতে। রণেনবাবুকে বলে দিয়েছি, আপনার মেয়ের বিয়ের সময়, সব মাছের দায়িত্ব আমার, কোলাঘাটের ইলিশ, রায়দীঘির গলদা চিংড়ি···

কথা থামিয়ে সে পকেট থেকে একটা সিগারেট-প্যাকেট বার করে বলল, নিন স্যার—

প্রণব বলল, থাক।

বিষ্টু বলল, আপনাদের এখনও দেরি আছে, আগে আমাদের দু'জন বেরিয়ে আসুক···আপনাদের তো অসুবিধে নেই, কী বউদি, কালকের পার্শে মাছগুলো ভাল ছিল তো? আপনি বিশ্বাস করছিলেন না—

মিলির দিকে এতক্ষণ সে ভাল করে তাকায়নি। এবার দেখল। আস্তে আস্তে তার মুখের ফাঁকটা বড় হতে লাগল, তারপর হা-হা করে হেসে উঠল। দারুণ খুশিতে হাসতে হাসতে সে বলল, তা হলে আপনারাও···ওই যে আর একটা গাড়ি থামছে, দেখুন, দেখুন,

একজন বাচ্চাকে নিয়ে দু জন নামছে···ডেকে জিজ্ঞেস করব, ওরাও ফলস ভোটের কেস কি না—

মিলি মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রণবের মুখখানা আমসি-বর্ণ, ঠিক এরকম জায়গায় ধরা পড়ে যেতে হবে, সে কল্পনা করেনি।

এর মধ্যে রিণ্টু খিল খিল করে হেসে উঠল। পরিষ্কার, সরল, ঝর্নার জলের মতন হাসি। বিণ্টুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সেও হাসতে লাগল ক্রমশ জোরে জোরে। খুব মজা পেয়েছে সে।

প্রণবের মুখের রং ফিরে এল। ছেলের মুখে হাসি দেখলে পৃথিবীর কোন বাবা গোমড়া হয়ে থাকতে পারে? এটা তো হাসিরই ব্যাপার। সেও হাসছে। মিলিও হাসছে। সমস্ত গ্লানি উড়ে গেল সেই হাসিতে।

প্রণব বলল, কী রে, রিণ্টু তুই এই ইস্কুলের বদলে অন্য একটা ইস্কুলে পড়বি!

ঘাড় হেলিয়ে, লম্বা করে টেনে রিণ্টু বলল, হ্যাঁ-অ্যা-অ্যা-অ্যা! মা যে বলছিল···

এখনও সে হাসি সামলাতে পারছে না। অন্য সবার মধ্যে হাসি ছড়িয়ে দিলে।

ট্যাক্সিটা তখনও থেমে আছে। ড্রাইভার ভেতরে বসে হিসেব করছে টাকা-পয়সার।

সেদিকে হাত তুলে প্রণব বলল, দাঁড়ান, আমরা আবার যাব।

চেয়ার

আগাগোড়া শ্বেতপাথরে বাঁধানো বিশাল চওড়া সিঁড়ি। দুধের মতন সাদা, কোথাও এক ছিটে ধুলো নেই। এক পাশের রেলিংটা মনে হয় যেন সোনা দিয়ে তৈরি। এককালে যেসব ছিল রাজা-রানীদের বাড়ি, এখন সেগুলিই মিউজিয়াম।

সিঁড়ির মুখে এসে অমিত জিজ্ঞেস করলো, মা, তুমি এতখানি সিঁড়ি উঠতে পারবে?

হৈমন্তী মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, পারবো।

অমিত আবার বললো, তোমার পায়ে ব্যথা।

হৈমন্তী বললেন, না, না, ব্যথা নেই, আজ ব্যথা নেই!

রাজা-রানীদের নিশ্চয়ই শরীরে বেশ জোর থাকতো। রোজ এতটা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা, তারপর বারান্দাগুলো কী দারুণ লম্বা, কত যে ঘর তার ইয়ত্তা নেই। রাজা-রানীরা এত হাঁটতে পারতেন? বাড়ির মধ্যে তো আর পালকি চড়া যায় না!

অমিত বললো, মা, আস্তে আস্তে ওঠো!

হাঁটুতে জোর কমে গেছে, ইদানীং সিঁড়ি ভাঙতে হৈমন্তীর বেশ কষ্ট হয়। সিঁড়ি ভাঙার অভ্যেসটাও চলে গেছে। এদেশে তাঁর ছেলের বাড়িটা দোতলা। হৈমন্তী একতলার একটি ঘরে থাকেন। রেল স্টেশানে কিংবা বিমানবন্দরে এমনকি বড় বড় দোকানেও এসকেলেটর থাকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় না।

দু হাঁটুই বেশ টনটন করছে, তিনতলা পর্যন্ত উঠতে বুকে চাপ লাগছে, তবু হৈমন্তী মুখে কিছুই স্বীকার করবেন না। ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে রেখেছেন। কষ্ট হচ্ছে বলে কি এত সব ভালো ভালো জিনিস দেখবেন না? দিনের পর দিন তো বাড়িতেই বসে থাকতে হয়। এসব দেশে এই এক জ্বালা! নিজে নিজে বাড়ি থেকে বেরুনো যায় না। কলকাতায় থাকতে হৈমন্তী একা একা

ট্রামে বাসে চলাফেরা করতেন। এখানে কেউ সঙ্গে নিয়ে না গেলে কোথাও যাবার উপায় নেই। সব কিছুই দূরে দূরে। গাড়ি ছাড়া যাওয়া যায় না। হৈমন্তী ফরাসি ভাষাও জানেন না। একা চলাফেরা করতে ভয় হয়। ছেলে আর ছেলের বউ দুজনেই চাকরি করে, সারা সপ্তাহ খুব ব্যস্ত, আর ছুটির দিনে ক্লান্ত হয়ে থাকে।

সবাই জানে, হৈমন্তী এখন ফরাসি দেশে আছেন ছেলের বাড়িতে। কিন্তু আসলে তো থাকেন প্রায় বন্দী অবস্থায় একটা বাড়ির মধ্যে, সে বাড়িও শহর থেকে বেশ দূরে। এইভাবেই কেটে যায় মাসের পর মাস।

ভাগ্যিস অমিতের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এসেছে কলকাতা থেকে। তাই অমিত তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। অন্য সময় অমিত যখন বন্ধুদের বাড়িতে পার্টিতে যায়, তখন হৈমন্তীকে দু'একবার অনুরোধ করলেও তিনি সঙ্গে যেতে চাননি। অল্পবয়েসী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে তিনি কী করবেন? ওদেরই অস্বস্তি হবে।

আজ হৈমন্তী নিজেই ছেলেকে বলেছেন, তোরা মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছিস, আমাকে সঙ্গে নিবি?

অমিতের বন্ধু সত্যেশ ছবি ভালোবাসে, ইতিহাস ভালোবাসে। একতলা, দোতলা ঘুরে ঘুরে সবাই চলে এলো তিনতলায়। কত-রকম ছবি আর ভাস্কর্য। দোতলাটায় শুধু ইজিপশিয়ান শিল্প। হৈমন্তীর সবই দেখতে ভালো লাগছে। শুধু বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে এইসব মূল্যবান সব শিল্প দেখার আনন্দ কত বেশি। শরীরের কষ্ট হচ্ছে হোক। হৈমন্তীর পুত্রবধূ ফরাসি মেয়ে, সে অবশ্য আজ আসতে পারেনি, তার অফিস আছে। এলেন মেয়েটি খুবই ভালো, হৈমন্তীর যত্ন করে প্রাণ দিয়ে।

তিনতলায় সব আধুনিককালের ছবি। এসব ছবি হৈমন্তী ঠিক বুঝতে পারেন না, তবু অমিত আর সত্যেশ কতরকম আলোচনা করছে, তিনি শুনছেন।

এক সময় ওরা দু'জন খানিকটা দূরে সরে গেল। বোধহয় সিগারেট খাবে। ছেলেকে হৈমন্তী বলেই দিয়েছেন তাঁর সামনে সিগারেট খেতে, কিন্তু সত্যেশ লজ্জা পায়।

ওর দু'জন আড়ালে যেতেই হৈমন্তীর শরীরটা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। শুধু দুই হাঁটু নয়, কোমরের নিচের সব অংশটা যেন অবশ হয়ে আসছে। একবার একটু না বসলেই নয়।

কিন্তু বসবেন কোথায়? একটার পর একটা ঘরে দেয়াল ভর্তি ছবি! কোনো কোনো ঘরে পুরনো আমলের সোনা-রুপোর জিনিসপত্র। অনেক জিনিসে যাতে হাত না দেওয়া হয়, সেইজন্য দড়ি দিয়ে ঘেরা।

ঘুরতে ঘুরতে হৈমন্তী হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক জায়গায় একটা চেয়ার। ভেলভেট দিয়ে মোড়া চেয়ারটার হাতল দুটো সোনালি রঙের। অনেকটা যাত্রা দলের রাজা-রানীদের চেয়ারের মতন। এসব জায়গায় প্রত্যেক ঘরে একজন করে গার্ড থাকে। হৈমন্তী ভাবলেন, এটা কোনো গার্ডের চেয়ার। সে কোথাও উঠে গেছে। এখানে একবার বসা যায় না?

শরীর আর বইছে না। পা দুটো বিদ্রোহ করছে। একটু বসলে ক্ষতি কী?

হৈমন্তী আর দ্বিধা না করে বসে পড়লেন। চওড়া কালো পাড়ের শাড়ি পরা, সাদা ব্লাউজ, মাথার সিঁথি সাদা, চোখে নস্যি রঙের চশমা, হৈমন্তী সেই চেয়ারে বসে একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন।

পা দুটি শান্তি পেয়েছে। হৈমন্তী হাত দুটি চেয়ারের হাতলের ওপর রাখতেই একটা হাতল টুপ করে খসে পড়ে গেল।

এই সব দেশে কেউ জোরে কথা বলে না। মিউজিয়ামে ফিসফিস করে কথা বলাই নিয়ম। ঘরের মধ্যে অন্য অনেক লোক ছিল, কোনো শব্দ ছিল না, চেয়ারের হাতলটা ভেঙে পড়ার একটা শব্দ হলো।

হৈমন্তী লজ্জা পেয়ে হাতলটা কুড়োতে যেতেই একজন গার্ড ছুটে এলো তাঁর সামনে। মধ্যবয়েসী লম্বা লোকটি কী যে বলতে লাগলো, হৈমন্তী কিছুই বুঝতে পারলেন না। লোকটি বেশ উত্তেজিত হয়েছে মনে হচ্ছে। হৈমন্তী ভাবলেন, চেয়ারটা যদি ভেঙেই

গিয়ে থাকে, তাঁর ছেলে এসে সারাবার খরচ দিয়ে দেবে। তাঁর ছেলে ভালো চাকরি করে।

গার্ডের চেঁচামেচিতে হৈমন্তী কোনো সাড়া শব্দ করছেন না দেখে আরও দু'তিনজন এলো সেখানে। তার মধ্যে একজনের চেহারা মেয়ে পুলিশের মতন। সেই মহিলাটি হৈমন্তীর হাত ধরে টেনে তুললো।

হৈমন্তী ফরাসি ভাষা জানেন না বটে, কিন্তু মোটামুটি কাজ চালানো ইংরিজি জানেন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে এখানে আছে, তাকে ডাকো।

পুলিশের মতন মহিলাটি সে কথায় কর্ণপাত করলো না। হৈমন্তীর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ছোট ঘরে। তারপর তিন-চারজন নারী-পুরুষ এসে তর্জন-গর্জন করতে লাগলো তাঁর ওপর।

কিছুই না বুঝতে পেরে হৈমন্তী ভয়ার্ত-স্বরে বলতে লাগলেন, আমার ছেলে? আমার ছেলে?

একটুক্ষণের মধ্যেই অমিত আর সত্যেশ সেখানে এসে পৌঁছোলো অবশ্য। অমিত চোস্ত ফরাসি ভাষায় তর্ক শুরু করে দিল। ক্রমশ একটা ঝগড়া লাগার উপক্রম।

মিনিট পনেরো এই রকম বাদানুবাদ চলার পর অমিত এক সময় বললো, মা, ওঠো! চলো এবার।

বেশ রাগত স্বর। ঐ লোকগুলোর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে অমিতের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।

মিউজিয়ামের বাইরে এসে হৈমন্তী জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকগুলো কী বলছিল রে?

অমিতের বদলে তার বন্ধু সত্যেশ হাসতে হাসতে বললো, মাসিমা, আপনি বেশ ঐ চেয়ারটাতে বসে পড়লেন?

হৈমন্তী বললেন, পায়ে ব্যথা করছিল! খালিই তো ছিল চেয়ারটা। তবে বিশ্বাস করো, হাতলটা আমি ভাঙিনি। লাগানো ছিল আলগা করে। আমি হাত রাখতেই মটাং করে ভেঙে গেল!

সত্যেশ হাসতে লাগলো।

হৈমন্তী আবার বললেন, একটা হাতল ভেঙে গেছে, তাতে অত রাগারাগি করার কী আছে? হাতলটা আগেই ভাঙা ছিল। সে যাই হোক, হাতলটা কি আমরা সারিয়ে দিতে পারতাম না?

এবার অমিত মায়ের দিকে ফিরে দারুণ ঝাঁঝালো গলায় বললো, ঐ চেয়ারটার দাম কত জানো? শুধু আমাকে না, আমার তিন পুরুষকে বিক্রি করলেও ওর দাম উঠবে না!

সব মাকেই মাঝে মাঝে ছেলের কাছে ধমক খেতে হয়। হৈমন্তী অবিশ্বাসের সুরে, হাসিমুখে বললেন, যাঃ কী বলছিস! ঐ রকম একটা ভাঙা চেয়ার, তার দাম…

অমিত একই রকম বদ মেজাজে বললো, ওটা কার চেয়ার জানো? মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর!

সন্তোশ বললো, মাসিমা, মেরি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন—

তাকে বাধা দিয়ে হৈমন্তী বললেন, জানি। ফরাসি দেশের রানী। ফরাসি বিপ্লবের সময় তাঁকে মেরে ফেলা হয়!

ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে ভাবে, মায়েরা বুঝি কিছুই জানে না। হৈমন্তী কলেজ জীবনে ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লবের কথা পড়েছিলেন, এখনো মনে আছে সেসব কথা।

রাস্তা পার হয়ে পার্কিং লটের দিকে যেতে যেতে অমিত আবার বললো, ঐ চেয়ার ছোঁয়াই নিষেধ। ওখানে বসলে ফাইন হয়। আর হাতলটা ভেঙে ফেলার জন্য ওরা তোমাকে জেলে দেবে বলছিল!

সন্তোশ বললো, ওদেরও দোষ আছে। দড়ি দিয়ে ঘেরা থাকে, দড়িটা যে খুলে গেছে, তা ওরা খেয়াল করেনি কেন?

অমিত বললো, পাশেই তো বোর্ড লাগানো আছে!

গাড়িটা খুঁজে পেয়ে দরজা খুলতে খুলতে অমিত আবার বললো, আমরা একটুখানির জন্য বাইরে গেছি, তার মধ্যেই এমন একটা কান্ড করে ফেললে? মা, তোমাকে কতবার বলেছি এসব দেশে যেখানে সেখানে হাত দিতে নেই!

এতক্ষণ বাদে অভিমান হলো হৈমন্তীর।

তিনি বললেন, ওরা আমাকে জেলে দিতে চেয়েছিল, ছাড়িয়ে আনলি কেন? ভালোই তো হতো! আমার কাছে সবই সমান!

বাড়িতে আসার পর পুত্রবধূ এলেন সব শুনে চোখ কপালে তুললো।

সে বললো, আপনি কী করেছিলেন মা? এর আগে একজন লোকের দশ হাজার ফ্রাংক ফাইন হয়েছিল এজন্য।

হৈমন্তী আর কী বলবেন, মুখ নিচু করে রইলেন। এতক্ষণে তিনি গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছেন। এক সময় চলে গেলেন নিজের ঘরে।

এসব দেশে ঘটনা বৈচিত্র্য খুব কম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, একই রকম জীবন। কিন্তু এটা একটা বলার মতন রোমহর্ষক ঘটনা। এক বিধবা বাঙালি আর একটু হলে ফরাসি দেশের জেলে চলে যাচ্ছিলেন! টেলিফোনে টেলিফোনে চেনাশুনো সকলের কাছে ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেল।

সন্ধেবেলা দুটি দম্পতির নেমন্তন্ন এ বাড়িতে, সত্যেশেরও তারা চেনা। অন্য দিন হৈমন্তী সকলের সঙ্গে এসে বসেন, ওরা তাঁর সামনেই মদ খায়, তিনি কিছুই মনে করেন না। এদেশে তো মদ খেয়ে কেউ মাতলামি করে না, অনেকটা চা-কফির মতনই ব্যাপার। আজ কিন্তু হৈমন্তী রয়ে গেলেন রান্নাঘরে। ওখানেও আজকের ঘটনাটাই আলোচনা হচ্ছে। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলার জন্য অমিতের মায়ের নির্ঘাৎ জেল হতে পারতো, হয়নি যে সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। অমিত চোস্ত ফরাসি ভাষায় মিউজিয়ামের প্রহরীদের নিরস্ত করেছে। প্রহরীদের কী কী যুক্তি-বাদে অমিত বিদ্ধ করেছে, তা সে বন্ধুদের শোনাতে লাগলো বারবার।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি হতে লাগলো।

দু'গেলাস মদ খাবার পর অমিতের মেজাজটা ভালো হয়ে গেছে। রান্নাঘরে বরফ নিতে এসে সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ওঃ, আজ কী ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! ওদের ওপর চোট-পাট করছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপছিলাম! সত্যি যদি তোমাকে জেলে দিত। মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার ভেঙে ফেলা, এটা একটা খবরের কাগজে বেরুবার মতন খবর।

হৈমন্তী মিনমিন করে বললেন, চেয়ারটা ভাঙা ছিল। আমি শুধু একটু হাত রেখেছি।

অমিত বললো, বোধহয় আঠা দিয়ে জুড়ে রেখেছিল। কিন্তু সে কে প্রমাণ করতে যাবে? ওরা বললো, ভেঙে গেছে। যাক গে, তুমি আর মন খারাপ করে থেকো না।

রাত্তিরবেলা হৈমন্তী এক সুন্দরী রমণীকে স্বপ্ন দেখলেন। মাথা ভর্তি সোনালি চুল, কিন্তু মুখখানা খুব বিষণ্ন। মেয়েটি নিজের গলায় হাত বুলোচ্ছে আর হৈমন্তীকে কিছু যেন বলতে চাইছে। মুখখানা চেনা চেনা লাগছে।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মহিলাটি, সাদা রঙের পোশাক পরা। মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।

হৈমন্তী এবার দেখতে পেলেন তার গলায় একটা গোল দাগ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিউরে উঠলেন।

এ তো রানী মেরি আঁতোয়ানেৎ!

ফরাসি বিপ্লবের সময় এঁর গিলোটিনে প্রাণ গিয়েছিল। অর্থাৎ গলাটা কেটে ফেলা হয়েছিল! সেই মেরি আঁতোয়ানেৎ স্বপ্নে দেখা দিলেন কেন? হৈমন্তী আজ তাঁর চেয়ারে বসে পড়েছিলেন বলে রেগে গেছেন? রাজা-রানীদের চেয়ারে তার মতন সাধারণ মানুষদের বসতে নেই!

মেরি আঁতোয়ানেৎ যেন হৈমন্তীর মনের কথা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লেন খুব জোরে। যেন বলতে চাইছেন, না, না, না, না···

হৈমন্তী বললেন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি ভুল করে বসে ফেলেছি···

মেরি আঁতোয়ানেৎ কিছু বলতে গেলেন, বোঝা গেল না। আর তাঁকে দেখাও গেল না। এই সময় হৈমন্তী শুনতে পেলেন নিচের দরজায় কলিং বেল বাজছে।

বেলটা বেজেই চললো, কেউ খুলছে না। অমিতরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে এখন গভীর ঘুমে মগ্ন। সহজে জাগবে না।

হৈমন্তী নিজেই বেরিয়ে এলেন। এসব দেশে গভীর রাতে

কিংবা শেষ রাতে অতিথি আসা আশ্চর্যের কিছু নয়। মাঝরাতে প্লেন আসে। দেশ থেকে হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে।

দরজা খুলতেই দেখলেন একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

নীল রঙের একটা লম্বা কোট পরা, বুকে একটা হাত, মাথায় সামান্য টাক। বাইরে আবছা অন্ধকার বলে মুখটা ভালো দেখা যাচ্ছে না।

সাহেবটি অনেকটা ঝুঁকে হৈমন্তীকে অভিবাদন জানালো। তারপর ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলো, তুমি হৈমন্তী দেবী?

হৈমন্তী বিহ্বলভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, দাঁড়ান, আমার ছেলেকে ডেকে দিচ্ছি।

সাহেবটি হাত তুলে বললো, কোনো দরকার নেই।

তারপর পেছন ফিরে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করলো।

একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি। সেখান থেকে দুটো লোক নেমে, ধরাধরি করে নিয়ে এলো একটা চেয়ার।

হৈমন্তীর রক্ত হিম হয়ে গেল। এই তো সেই চেয়ারটা! ওরা এখনো ছাড়েনি? এই চেয়ারের দাম দিতে হবে নাকি। এত রাত্তিরে বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে। তাঁর ছেলে অত টাকা পাবে কোথায়?

নীল কোট পরা সাহেবটি বাড়ির সামনের ছোট্ট বাগানে চেয়ারটা নামিয়ে রাখতে বললো।

হৈমন্তী ব্যাকুলভাবে বললেন, বিশ্বাস করুন, মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ারটা আমি ভাঙিনি। ভাঙাই ছিল। আমি শুধু ভুল করে বসেছিলাম। সেজন্য আমাকে জেলে দিতে চান নিয়ে চলুন, আমার ছেলেকে কিছু বলবেন না।

নীল কোট পরা সাহেবটি উগ্র স্বরে বললো, কে বলেছে, এটা মেরি আঁতোয়ানেৎ-এর চেয়ার? ওরা কিচ্ছু জানে না। এটা আমার চেয়ার ছিল। আমি এই চেয়ারে বসে জুতো পরতাম!

সাহেবটি চেয়ারে বসে পড়ে একবার দু'পা তুললো। আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার চেয়ার। আমি অনুমতি

দিচ্ছি, তুমি এই চেয়ারে যত খুশি বসতে পারো। বসো, এখন বসে দ্যাখো।

হৈমন্তী বললেন, না, না, আমি আর বসতে চাই না।

সাহেবটি বললো, আমি বলছি, তুমি বসো। তোমার জন্যই আমি নিয়ে এসেছি।

হৈমন্তী বললেন, এটা আপনার চেয়ার? তবে যে ওরা বললো··· আপনার নাম কী?

সাহেবটি হাসলো, হৈমন্তীর দিকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে বললো, আমাকে নিজের মুখে নাম বলতে হবে? আজকাল লোকে বুঝি আমায় ভুলে গেছে?

এবার হৈমন্তী চিনতে পারলেন। ছবিতে দেখেছেন বহুবার। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট!

সেই গাছটির নিচে

আমার বন্ধু তপন প্রথম আমাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই ক্লাবে। ক্লাবের নামটি বিচিত্র, 'সুখী পরিবার', বিশেষ কেউ এর নাম শোনে নি। যে-কেউ এ ক্লাবের সদস্য হতে পারে না। এখানে ভর্তি হবার শর্ত হলো, অন্য সদস্যদের সঙ্গে কিছু না কিছু একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে হবে। অর্থাৎ সবাই এক পরিবারের মানুষ।

আসলে কিন্তু তা নয়।

বকুলবাগানে গগন ভদ্রের একটা ছিমছাম দোতলা বাড়িতে এই ক্লাবের অধিবেশন হয় প্রত্যেক শনি-রবিবার। এ বাড়ির একতলার বসবার ঘরটি প্রায় একটা হলঘরের মতন বড়। বাড়ির সামনেটায় বাগান ও সবুজ ঘাসের লন, এই পাড়াটাও খুব নিরিবিলি। গগন ভদ্র একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের মালিক, বেশ সচ্ছল অবস্থা, উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বলা যায়, আমরা অল্প বয়েসে অবশ্য তাঁকে খুব বড়লোক ভাবতাম। গগন ভদ্রের স্ত্রী নমিতা অতি চমৎকার মহিলা, এক একজন মানুষের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, নমিতার মুখখানি সেরকম স্নিগ্ধ।

সারা সপ্তাহ গগন ভদ্র খুব ব্যস্ত থাকলেও শনিবার আর রবিবার কোনো কাজ করবেন না প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এই দু'দিন শুধু আড্ডা, গান, কবিতা, আবৃত্তি, নাটক। সেই জন্যই ক্লাব। গগনদা এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর নমিতাদি মধ্যমণি।

এই সুখী দম্পতিটির কোনো ছেলে-মেয়ে ছিল না। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, গগন ভদ্রের কোনো ভাইবোন নেই, নমিতাদির একটি মাত্র বোন ছিল, সেও মারা গেছে। এমন সুন্দর একটা বাড়ি, টাকা-পয়সারও অভাব নেই, অথচ মধ্য-জীবনে পেঁাছে ওঁরা দুজন বুঝলেন, একটা ধূসর রুক্ষ মাঠের মতন ওঁদের সামনে পড়ে আছে নিদারুণ নিঃসঙ্গতা।

নমিতাদির যে-বোন মারা গেছে, তার দুটি ছেলে-মেয়ে, পিঠোপিঠি ভাইবোন, দুজনেই তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তারা এ বাড়িতে আসতো মাঝে মাঝে। গগনদার বাবার দুটি বিয়ে, দ্বিতীয় পক্ষের দুই বোন, তাদের তিনটি ছেলে আছে। এইসব ছেলে-মেয়েদের নিয়ে শুরু হয়েছিল ক্লাবটা। তারপর ঐসব ছেলে-মেয়েদের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনেরাও আসতে লাগলো। আত্মীয়তার সম্পর্কটা অতি ক্ষীণ হতে থাকলেও রইলো তো কিছু একটা! নমিতাদির বোনের মেয়ে গীতালি আর মিতালির পিসতুতো জামাইবাবুর ভাই হচ্ছে তপন। তাহলে গগনদার সঙ্গে তার সম্পর্ক দাঁড়ালো? সে হিসেব আমি জানি না!

তপন আমার বন্ধু, ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে স্কুলে পড়েছি। কোনো আত্মীয়তা নেই। কিন্তু আমার এক পিসতুতো দাদার বিয়েতে গিয়েছিলাম শ্রীরামপুর, সেই বিয়েবাড়িতে হঠাৎ তপনের সঙ্গে দেখা। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তুই কোন্ সুবাদে নেমন্তন্ন খেতে এলি রে? তপন বলল, বাঃ, কনে যে আমার দিদি। আপন দিদি নয়, আমার ফুলমাসির মেয়ে। তাহলে আমার পিসতুতো বউদি হলো তপনের মাসতুতো দিদি। খুব একটা দূর সম্পর্ক বলা যায় কি?

এর কয়েকদিন পরেই তপন বলল, চল, তোকে একটা ক্লাবে নিয়ে যাবো।

আমার পরিচয় জানতেই নমিতাদি বললেন, বাঃ তুমি আমাদের নতুন সদস্য হলে। নিয়মিত প্রত্যেক সপ্তাহে আসতে হবে কিন্তু!

এই ক্লাবে একটা দারুণ সম্বোধন সমস্যা থাকার কথা। সম্পর্কের সূত্র ধরে গগনদা কারুর কাকা বা মামা বা পিসে বা দাদু। সেই জন্য নিয়ম হয়েছে, সবাই শুধু গগনদা আর নমিতাদি বলবে।

গগনদার ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, মুখখানা গম্ভীর ধরনের হলেও হঠাৎ হঠাৎ মজার কথা বলেন। নমিতাদির বেশ ভরা শরীর, রানী-রানী ভাব, কিন্তু একটুও অহঙ্কারী নন, ঠোঁটে সব সময় হাসি লেগে আছে।

শনি আর রবিবার আমাদের আসর বসতো সন্ধে সাড়ে ছটায়,

চলতো ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। আমরা অনেকেই তখন ছাত্র, কেউ কেউ সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। এই ক্লাবের এমনই আকর্ষণ ছিল যে এই দুদিন অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছেই করতো না।

গগনদা পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও নানারকম বই পড়তেন। আমাদের না-পড়া অনেক বই সম্পর্কে শুনেছি ওঁর কাছ থেকে। নমিতাদিও গগনদার অফিসের কাজকর্ম দেখেন, শিক্ষিতা মহিলা, তাঁর গানের গলাটিও বেশ ভালো। আমার দৃঢ় ধারণা, ইচ্ছে করলেই তিনি নামকরা গায়িকা হতে পারতেন। কিন্তু নাম করার দিকে ওঁর কোনো ঝোঁকই ছিল না।

ওঁদের দুজনেরই স্বভাবের আর একটা ভালো দিক এই যে ওঁরা কক্ষণো বেশি বেশি কর্তৃত্ব করতেন না, নিজেরাই বেশি কথা বলতেন না। ওঁরা আমাদের সমবয়েসীর মতন ফক্কুড়ি-ইয়ার্কিও করতেন, প্রশ্রয় দিতেন ছোটখাটো দুষ্টুমির। আর একটা নিয়ম ছিল, প্রত্যেক সদস্যকেই মাঝে মাঝে কিছু একটা করতে হবে। হয় গল্প বলা কিংবা আবৃত্তি কিংবা গান বা নাচ। যে বলবে, আমি কিছুই পারি না, তার পেছনে লাগা হবে। আমি যেদিন প্রথম ঐ কথা বলেছিলাম, সেদিন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে এসে জোর করে আমার হাত ধরে টেনে তুলে বলেছিল, আর কিছু না পারো, নাচতে পারবে নিশ্চয়ই! তারপর সে কি হাসির হুল্লোড়।

তখন এই ক্লাবের সদস্যের সংখ্যা ছাব্বিশজন তার মধ্যে আঠারো-উনিশজন নিয়মিত আসে। আড্ডা ও নাচ-গান-কবিতা ছাড়াও আর একটা আকর্ষণ ছিল। খাওয়া-দাওয়া হতো দারুণ। গগনদাদের একজন বাবুর্চি ছিল, তার রান্নার হাতখানা বাঁধিয়ে রাখার মতন! প্রত্যেক সপ্তাহে নিত্য-নতুন চপ-কাটলেট-ফ্রাই আর মিষ্টি। খুব দামি চা, যতবার খুশি! চাঁদা নেই!

এই ক্লাবে বেশ কয়েকবার যাবার পর আমি দুটো জিনিস লক্ষ্য করলুম। বেশ সুন্দর সময় কাটে, আনন্দ ও হুল্লোড় হয়, সাহিত্য-সঙ্গীতের চর্চা হয় বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছু কিছু সদস্যের মধ্যে একটা টেনশন আছে। এই নিঃসন্তান দম্পতিটির উত্তরাধিকারী কে হবে? সবাই যখন কিছু না কিছু আত্মীয়, তখন

এদেরই মধ্যেই তো কারুর পাওয়া উচিত ! সেই জন্য কার কতটা আত্মীয়তা বেশি কিংবা কে ওঁদের দুজনের বেশি প্রিয় হতে পারে, তা নিয়ে কয়েকজনের মধ্যে রীতিমতন একটা প্রতিযোগিতা আছে ! আমার অবশ্য এতে মাথা গলাবার কোনো কারণ নেই, কারণ সম্পর্কের বিচারে আমি কুড়িজনের চেয়েও পিছিয়ে !

আর একটা প্রতিযোগিতাও আছে। প্রেমের ! এর মধ্যে অনেকেই অনেককে আগে চিনতো না, লতায়-পাতায় আত্মীয়তা এতই দূরের যে প্রেম তো হতেই পারে, সম্বন্ধ করে বিয়েতেও কোনো বাধা নেই। কে কার পাশে বসে, কে কার দিকে বেশিক্ষণ চেয়ে থাকে, তা থেকে বোঝা যায় কী রকম প্রেমের খেলা চলছে।

উত্তরাধিকারের প্রতিযোগিতায় আমার কোনো স্থান নেই বটে, প্রেমের ব্যাপারে উদাসীন থাকবো কী করে ? কিন্তু আমি বোকার মতন এমনই একজনের প্রেমে পড়লুম, যার হৃদয় স্পর্শ করার কোনো সম্ভাবনাই আমার নেই। কিন্তু প্রেম যে যুক্তি মানে না !

দীপা, ভাস্বতী, রীণা, পুতুল এবং শকুন্তলা, এই পাঁচজনই ছিল মোট এগারোটি মেয়ের মধ্যে বেশি আকর্ষণীয়া। এদের মধ্যে আবার শকুন্তলা সবাইকে ছাড়িয়ে একেবারে আলাদা। শকুন্তলা সাইকোলজি নিয়ে এম. এস-সি. পড়ছে, প্রখর তার রূপ, সেই রূপ সম্পর্কে সে নিজেও খুব সচেতন। তার শরীরে ঢল ঢল করছে লাবণ্য, ভুরু দুটি যেন কন্দর্পের ধনুক। সে আবার নমিতাদির বোনের বড় মেয়ে, আত্মীয়তার দিক থেকেও ওঁদের খুব কাছাকাছি। শকুন্তলাদের নিজেদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল, এই পরিবারের সম্পত্তিও খুব সম্ভবত তার ভাগ্যেই ঝুলছে।

অন্তত চারজন যুবক শকুন্তলার কাছাকাছি সব সময় ঘুর ঘুর করে। আমার বন্ধু তপনও তাদের মধ্যে একজন। ওদের মধ্যে আবার সুব্রত আর দীপকের মধ্যে খুব রেষারেষি চলছে। সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার, সুন্দর স্বাস্থ্য, ভালো কবিতা আবৃত্তি করে। দীপক ডাক্তারির ফাইন্যাল ইয়ারে, দুর্দান্ত গান গায়।

অর্থাৎ আমি প্রথম থেকেই ব্যর্থ প্রেমিক।

আমি শকুন্তলার পাশে বসবার কখনো চেষ্টাও করি না। বরং

একটু দূরে বসলে তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকা যায়। সত্যিই সে দেখার মতন নারী।

শকুন্তলার ব্যবহারে অবশ্য অহংকার নেই। সকলের সঙ্গেই সে মেশে, সকলের সঙ্গেই সে হেসে কথা বলে। যদি কেউ চুপচাপ বসে থাকে, শকুন্তলাই তাকে যেচে বলে, এইভাবে সে দু'বার আমাকে দিয়েও কবিতা পাঠ করিয়েছিল। এর বেশি কিছু না।

একদিন, একবারই শুধু কিছুক্ষণের জন্য আমি শকুন্তলার খুব কাছাকাছি এসেছিলাম নাটকীয়ভাবে।

সারা দিনটাই ছিল মেঘলা, বেড়াবার মতন একটি দিন। আমি অবশ্য বেড়াতে বেরুই নি, হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম আমার এক কাকাকে ট্রেনে তুলে দিতে। বাসে করে ফিরছি প্রায় ঝুলতে ঝুলতে, আকাশে কড়কড়াৎ শব্দে বাজ ডাকছে, যে-কোনো সময় অঝোরে বৃষ্টি নামবে। রেড রোড ধরে আসতে আসতে হঠাৎ মনে হলো, ঠিক শকুন্তলার মতন একটি মেয়ে একলা দাঁড়িয়ে রাস্তায়। বাসটা তাকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে, ভালো করে দেখতে পাই নি, শকুন্তলা এরকম মাঝরাস্তায় একলা দাঁড়িয়ে থাকবেই বা কেন! নিশ্চয়ই চোখের ভুল। আমার বাসটার সামনে অন্য কোনো গাড়ি আসতেই যেই একটু গতি কমিয়েছে, আমি ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে নেমে গেলাম।

তখনও বাসটার বেশ গতি ছিল, ঝোঁক সামলাতে না পেরে একটা আছাড় খেয়ে আমার হাঁটু ছড়ে গেল বটে, কিন্তু পুরস্কারও পেলাম আশাতীত ভাবে।

সত্যিই শকুন্তলা দাঁড়িয়ে আছে একা। কাজেই ওদের বাড়ির গাড়ি, তার বনেট তোলা। গাড়িটা খারাপ হয়েছে, ড্রাইভার সেটা সারাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, আর শকুন্তলা হাত তুলে ডাকতে চাইছে ট্যাক্সি। কিন্তু এরকম দুর্যোগের দিনে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব প্রায়, তাও মাঝ রাস্তায়।

আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তার উদ্বেগমাখা মুখখানাতে আলো ফুটলো। সে বললো, কী মুশকিল বলো তো, গাড়িটা কখন ঠিক হবে কে জানে, ড্রাইভার যা পারে করবে, আমি বাড়ি

যাই কী করে? কোনো ট্যাক্সি থামছে না।

শকুন্তলা বললো, হাত দেখাচ্ছি তো, অন্য দু'একটা গাড়ি থামছে। তারা লিফ্‌ট দিতে চাইছে। সব গাড়িতে একলা একলা লোক। তাই ভয় করলো।

আমি বললাম, সেরকম কারুর গাড়িতে উঠলে তোমাকে নিরুদ্দেশে নিয়ে যাবে!

এই সময় আবার একশোটা কামান দাগার মতন শব্দ হলো আকাশে।

শকুন্তলার সুন্দর মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কী হবে, যদি মাথায় বাজ পড়ে?

আমি বললাম, পার্ক স্ট্রিটের দিকে গেলে তবু ট্যাক্সির চেষ্টা করা যেতে পারে।

শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে বললো, চলো, আমরা ওদিকে যাই। তুমি আমাকে তুলে দেবে।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো শকুন্তলা। বেশিদূর যাওয়া গেল না, হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নামলো জলপ্রপাত। বৃষ্টি নয় যেন আকাশগঙ্গা। আমরা দৌড়ে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়ালাম।

এখানে কাছাকাছি আর গাছ নেই। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, মাঝে মাঝে চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ।

শকুন্তলা বললো, বাজের শব্দে আমার খুব ভয় করে। ছেলেবেলা থেকেই।

শকুন্তলা নিজেই আমার একটা হাত চেপে ধরলো। এই প্রথম স্পর্শ।

বাজ সামলাবার কোনোই ক্ষমতা নেই আমার, তবু সান্ত্বনা দিয়ে বললাম ভয় নেই ভয় নেই।

শকুন্তলা বললো, শুনেছি গাছতলায় দাঁড়ালে, গাছের ওপরেই বাজ পড়ে?

আমি বললাম, সেটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে। শহরে কত বড় বড় বাড়ি, টেলিগ্রাফ-ইলেকট্রিকের পোল, ওরাই টেনে নেবে। তুমি

গাড়িতেই ফিরে যাবে, শকুন্তলা ?

শকুন্তলা বললো, একদম ভিজে যাবো যে ! এখানেই ভালো।

গাছ মানুষকে আশ্রয় দেয় বটে কিন্তু এমন তীব্র বৃষ্টির দিনে তাও বেশিক্ষণ পারে না।

শকুন্তলা বললো, ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল সুনীল ! আমার এমন ভয় করছিল—

সেদিন এক ঘণ্টা দশ মিনিট একটানা বৃষ্টি হয়েছিল প্রবল তোড়ে। জলে ডুবে ভাসছিল কলকাতার অর্ধেকটা। পরদিন খবরের কাগজে বেরিয়েছিল নানান বিপর্যয়ের কাহিনী।

আমরা দুজনে দাঁড়িয়েছিলাম সেই গাছতলায়, আমাদের কোনো বিপদ হয়নি অবশ্য। ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিলাম। বৃষ্টি যেন ধোঁয়ার মতন আমাদের ঘিরে ফেলেছিল, আমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমাদেরও দেখছিল না কেউ। বেদব্যাস যখন সত্যবতীকে সম্ভোগ করতে চেয়েছিলেন, তখন নৌকোর চারদিক ঘিরে ফেলেছিলেন কুয়াশায়। আমাদের দুজনেরও যেন সেইরকম অবস্থা। তবে সম্ভোগ টম্ভোগ কিচ্ছু না। শকুন্তলা শীতে কাঁপছিল থরথর করে, সেইজন্য আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। সে আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল। চুমু খেতে চাইলে আপত্তি করতো কি না কে জানে ! আমি সাহস করিনি, তাকে কোনো প্রেমের কথা তো বলিনি কখনো, ঐ অবস্থায় বলাও যায় না, আর প্রেমের কথা কিছু না বলে চুমু খাওয়াটা অতি বাজে ব্যাপার। শকুন্তলা যে আমার ওপর ভরসা করেছিল, আমার কাঁধে মাথা রেখেছিল, তাতেই আমি কুড়িটা চুম্বনের চেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি। দুজনের শরীরে নিবিড় স্পর্শ, আমরা খুব কাছাকাছি, শকুন্তলার এত কাছাকাছি কখনো আসবো, স্বপ্নেও ভাবিনি।

তারপর কয়েকদিনের মধ্যেই আমাদের অমন চমৎকার ক্লাবটা ভেঙে গেল। নমিতাদি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য গগনদা তাঁকে নিয়ে গেলেন বম্বে। এক মাসের মধ্যে শকুন্তলা চলে গেল অক্সফোর্ডে পড়তে, দীপক আর সুব্রত দুজনেই গেল জার্মানি।

শকুন্তলার সঙ্গে আর বার দু'এক মাত্র দেখা হয়েছিল আমার। বিদেশ যাবার আগে আরও অনেকের সঙ্গে আমাকেও নেমন্তন্ন করেছিল ওর বাড়িতে। ঐ বৃষ্টির দিনের ঘনিষ্ঠতার জন্যই নেমন্তন্নটা পাওয়া, নইলে ওর কাছের লোকদের মধ্যে আমি পড়ি না। শকুন্তলার ব্যবহারে অবশ্য আর তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। ছিল শুধু কৃতজ্ঞতা।

বিদেশেই বিয়ে করে সেট্‌ল করে গেছে শকুন্তলা। আর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রশ্ন নেই। সেজন্য আমার কোনো হা-হুতাশও নেই। শকুন্তলার কাছ থেকে কিছুই প্রাপ্য ছিল না আমার। তবু যে এক সন্ধেবেলা ওকে এত কাছে পেয়েছিলাম, সেটাই আমার কাছে একটা পুরস্কারের মতন।

রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিট যাবার রাস্তাটায় সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে আমি মাঝে মাঝে দাঁড়াই। এই গাছটার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক মানুষ যেমন মন্দিরে যায়, এই গাছটা আমার কাছে সেরকম একটা মন্দির। সেই কৃষ্ণচূড়ার নিচে আমি একা একা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি, অনুভব করি শকুন্তলার শরীরের সান্নিধ্য। আমি তার ওপর কোনো জোর করিনি, সে নিজে আমার হাত ধরেছিল। সে মাথা রেখেছিল আমার কাঁধে।

এ এক বিচ্ছেদের কাহিনী। ঠিক শকুন্তলার সঙ্গে নয়। শকুন্তলাকে আমি নিজের করে পাবো, তা তো আশাও করিনি। সেই এক বৃষ্টি সন্ধের মধুর স্মৃতিই যথেষ্ট। কিন্তু একদিন রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিটের দিকে যেতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার বুকে যেন হাতুড়ির ঘা লাগলো। সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটা নেই। কেউ কেটে ফেলেছে। একেবারে গোড়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে কোনো শয়তান। সেই শয়তানই শকুন্তলাকে আমার জীবন থেকে একেবারে কেড়ে নিয়ে গেল!

বন্ধ জানালা

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই পিসিমা একেবারে যেন আঁতকে উঠে বললেন, আরে থাক, থাক, ও কী করছিস, পা ছুঁতে হবে না, বোস, ঐ চেয়ারটাতে বোস !

চেয়ারে বসলো না, পলাশ দাঁড়িয়ে রইলো। তার হাতে একটা ব্রাউন রঙের প্যাকেট। ধপধপে সাদা প্যান্ট ও টকটকে লাল রঙের জামা পরা, চোখে কালো চশমা। এই শীতের মধ্যেও তার কপালে ও ঠোঁটের ওপরে বিন্দু ঘাম। ঘরের দরজার কাছে এক রাশ লোক ভিড় করে আছে, পিসতুতো ভাই কাজল চ্যাঁচাচ্ছে, ভেতরে আসবে না, কেউ ভেতরে আসবে না।

পলাশ চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ঘরের এক দেওয়ালের দিকে একটা খাট, অন্য দিকের দেয়ালের দিকে কয়েকটা পুরনো টিনের ট্রাঙ্ক চাদর চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। একটা আলনা একেবারে শূন্য, অগোছালো, অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়গুলো একটু আগে একটানে সরিয়ে নিয়েছে কেউ।

খাটের ওপর বসে আছেন পিসিমা, এই এগারো বছরের মধ্যে গাল দুটো আরও বেশি তুবড়ে গেছে, এছাড়া আর যেন কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে নস্যি রঙের শালটা গায়ে জড়িয়ে আছেন, সেটাও চেনা। এই ঘরটারও কোনো পরিবর্তন হয়নি, দেয়ালে একটা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ঝুলছে, সেটাই শুধু নতুন।

দরজার ভিড়ের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে পলাশ বলল, কেমন আছো, পিসিমা ?

পিসিমা বললেন, আমি ভালো আছি। তুই এখন কত বড় হয়েছিস, কত কাগজে ছবি থাকে, সবাই ধন্য ধন্য করে ! তুই এখানে আসতে গেলি কেন, পিলু ! তোর কত কষ্ট হলো।

পলাশ বলল, বাঃ, আমার বুঝি তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না ! কষ্টের কী আছে !

পিসিমা হেসে বললেন, বাপরে বাপ ! কী চ্যাঁচামেচি, কী হুড়োহুড়ি, মনে হয় যেন দরজা ভেঙে ফেলবে !

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে পলাশ বললেন, ও তো আছেই ! কী আর করা যাবে। নিশ্চয়ই কাজল কিংবা সজল খবরটা পাড়ায় বলে দিয়েছে।

সজল সেখানে নেই, কাজল বললে, আমি বলিনি। আমি কারুকে কিছু বলিনি।

দরজার কাছ থেকে একটি ছেলে ক্যামেরা তুলে চেঁচিয়ে বলল, গুবলু একবার মুখ ফেরাও ! একটা স্ন্যাপ নেবো।

একটি মেয়ে বলল, আমি একটু পাশে গিয়ে দাঁড়াবো। ও কাজলদা, প্লিজ, একবার।

কাজল বলল, এখন যা। এখন না, সব পরে হবে ! সরে যাও এখন, দরজাটা ক্লিয়ার করো।

ধীরুদা বললেন, কেউ যাবে না। দরজাটা বন্ধ করে দে ! এত গোলমাল হলে কোনো কথাই তো বলা যাবে না।

পিসিমাকে প্রণাম করলেও ধীরুদাকে প্রণাম করেনি পলাশ। হাতের প্যাকেটটা খুলে এগিয়ে দিয়ে সে বললে, পিসিমা, তোমার জন্য গরদের একটা শাড়ি এনেছি।

পিসিমা চোখ কপালে তুলে বললেন, এত দামি শাড়ি এ দিয়ে আমি কী করবো রে ? তুই কি পাগল হয়েছিস, পিলু ! এটা নিয়ে যা ! তোর মাকে গিয়ে দে বরং।

একটু আহতভাবে পলাশ বললেন, তোমার জন্য এনেছি, তুমি নেবে না ? আমি দিলে তুমি পরবে না ?

ধীরুদা বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ পরবে। তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন, পিলু, বোস !

পলাশ চেয়ারে বসলো না, বসলো পিসিমার খাটের এক কোণে। পিসিমা তার একটা হাত টেনে নিয়ে বললেন, ইস্, কী সুন্দর হয়েছিস ?

পলাশ তখনই অনুভব করলো, এইরকম জামা ও প্যাণ্ট পরা অবস্থায় সে এই খাটের ওপর বেমানান। একবার সে ভেবেছিল ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসবে, কিন্তু হোটেলে পুলিসের লোক যখন খবর দিল সকাল থেকেই এ বাড়ির সামনে কয়েক'শো ছেলে-মেয়ে জমে গেছে, তখনই সে বুঝেছিল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না ! ভিড়ের মধ্যে টানাটানিতে তার ধুতি খুলে যেতে পারে, তাছাড়া…।

ধীরুদা বললেন, আজকের সব কাগজে তোর ছবি বেরিয়েছে, ফার্স্ট পেজে, তুই কাল চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলি।

কাজল সগর্বে বললো, কাল চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে, আজ মায়ের সঙ্গে ! আচ্ছা পলাশদা, আমাদের বাড়ির সামনে পুলিস এলো কী করে ? ওরা আগে থেকে কী করে টের পায় ?

পলাশ কিছু উত্তর দেবার আগেই ধীরুদা বললেন, পুলিস তো বড়লোকের দারোয়ান। টাকা দিলে যখন তখন ভাড়া করা যায়। কত বিয়ে বাড়ির সামনে দেখিস না পুলিস দাঁড়িয়ে থাকে।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধীরুদা, গেরুয়া পাঞ্জাবি ও পা-জামা পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার কথার মধ্যে খানিকটা শ্লেষ পলাশের কান এড়ালো না। সে উত্তর দিতে পারতো যে, সে টাকা দিয়ে পুলিস ভাড়া করেনি। পুলিসের লোকরাই তাকে জিজ্ঞেস করছে সে কখন কোথায় যাবে, সেই অনুযায়ী ওরা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করছে।

কিন্তু পলাশ ধীরুদার কথায় গা করলো না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো। রাস্তার দিকের জানালাটা খোলা, সেখান থেকে নিচের গোলমাল ভেসে আসছে। রাস্তার উল্টোদিকে একটা হলদে রঙের বাড়ি, সে বাড়ির তিন তলার সব জানালা বন্ধ।

কাজল আমায় জিজ্ঞেস করলো, পলাশদা, চিফ মিনিস্টার তোমাকে চিনতে পারলেন ? তোমার কোনো ফিল্ম উনি দেখেছেন ?

পলাশ এই প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য বললো, যাঃ ! উনি ব্যস্ত মানুষ…

ধীরুদা বললেন, কাগজেই তো লিখেছে উনি না দেখলেও ওঁর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী দেখেছে !

কাজল বললো, জানুয়ারি মাসে বিরাট ফাংশান হবে, না ? বম্বের সব স্টার আসবে ?

পলাশ বললো, মোটামুটি অনেকেই…

আমরা টিকিট পাবো না !

পলাশ পিসিমার দিকে ফিরে বললো, আমি টিকিট পাঠিয়ে দেবো। পিসিমা আমরা ফ্লাড রিলিফের জন্য একটা ফাংশান করছি, তোমাকে যেতে হবে।

পিসিমা ফোকলা দাঁতে বালিকার মতন হেসে বললেন, যাঃ, আমি কী করে যাবো রে ! পায়ে ব্যথা, আমি আজকাল সিঁড়ি ভাঙতে পারি না। তাছাড়া আমার মতন বুড়ি-টুড়িরা কি ওখানে যায় ?

না পিসিমা তোমাকে যেতেই হবে।

কাজল বললো, পলাশদা, তুমি নাকি ঐ ফাংশানে গান গাইবে ?

পলাশ শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লো।

ধীরুদা বাঁকাভাবে বললো, তুই আবার গান শিখলি কবে ?

ধীরুদার কথা বলার ভঙ্গি পলাশের একটুও ভালো লাগছে না। এখন এখান থেকে চলে গেলেই হয়।

এগারো-বারো বছর আগে এই বাড়িতে পলাশকে থাকতে হয়েছিল প্রায় সাত-আট মাস। বেকার অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় একটা পুলিস কেস ছিল তার নামে। নিজের বাড়িতে থাকলে সে নির্ঘাৎ ধরা পড়ে যেত। এই পিসিমা তার আপন পিসিমা নন, বাবার পিসতুতো বোন। কিন্তু সেই দুঃসময়ে, সেই কষ্টের দিনে পিসিমা তাকে আপন সন্তানের মতন বুকের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

কলকাতায় এলে এখন পলাশকে গ্র্যান্ড হোটেলে উঠতে হয় ! ইচ্ছে মতন রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাকে ঘিরে ধরবে।

তবু সে ভেবেছিল, একদিন চুপি চুপি এসে পিসিমার সঙ্গে

দেখা করে যাবে। অনেকক্ষণ গল্প করবে। তাই সে খবর পাঠিয়েছিল, আজ দুপুরে পিসিমার হাতের রান্না খেয়ে যাবে।

কিন্তু পিসিমার ঘরে যে সর্বক্ষণ ধীরুদা উপস্থিত থাকবে, এ কথাটা তার খেয়াল হয়নি। তা হলে হয়তো সে আসতো না।

কাজল দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়েছে। এ বাড়ির অন্য ভাড়াটে ও কাজল-সজলের বন্ধু-বান্ধবরা আগে থেকেই খবর পেয়ে একতলা থেকে তিন তলার সিঁড়ি পর্যন্ত ভর্তি করে দাঁড়িয়েছিল।

হঠাৎ সে বলে ফেলল কোথাও নিরিবিলিতে দু'দণ্ড থাকার উপায় নেই, বুঝলে পিসিমা। সব সময় লোকে জ্বালাতন করে। সিনেমা করি বলে আমাদের যেন প্রাইভেট লাইফ থাকতে নেই। কতদিন যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আলুকাবলি খাইনি!

কাজল বলল, সে আর তুমি এ জীবনে পারবে না!

ধীরুদা বলল, আবার তোদের দেখে যদি রাস্তায় লোকের ভিড় না জমে তা হলেও বিপদ! তার মানে পপুলারিটি কমে যাচ্ছে! আমি তো শুনেছি কিছু কিছু ফিল্মস্টার নিজেদের এজেণ্ট লাগিয়ে ভিড় জমায়! আমারও তাই মনে হয়। না হলে, এত ছেলেমেয়ে তাদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, শুধু ফিল্মস্টারদের পেছনে দৌড়বে? ওয়েস্টবেঙ্গলের পলিটিক্যাল কন্সাস ইউথ…নিশ্চয়ই আগে থেকে পয়সা দিয়ে ভাড়া করে আনা কিছু লোক চাঁচামেচি করে একটা হুজুগ লাগিয়ে দেয়।

পলাশ ইচ্ছে করেই ধীরুদার এসব কথা শুনছে না। ধীরুদার সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে লাভ নেই। সে তাকিয়ে আছে রাস্তার উল্টোদিকের হলদে রঙের তিনতলা বাড়িটার বন্ধ জানলার দিকে। তার অন্য কথা মনে পড়ে যাচ্ছে!

কাজল বলল, তুমি বলছো কি বড়দা, রাস্তার ভিড়ের কথা ছেড়ে দাও, আমাদের বাড়িতে যে এত লোক ঢুকে বসে আছে, তাদের কি আমি পয়সা দিয়ে আনিয়েছি? ওরা এসেছে শুধু পলাশদাকে একবার কাছ থেকে দেখবে বলে। পলাশদা এখন বম্বেতে নাম্বার টু, অমিতাভ বচ্চনের পরেই!

ধীরুদা বলল, পিলুকে এ পাড়ার লোক কি আগে দেখেনি নাকি ? টানা দেড় বছর এ বাড়িতে থেকে গেছে।

সে কতদিন আগের কথা !

কথা ঘোরাবার জন্য পলাশ বলল, কী রান্না করেছ, বলো পিসিমা ! কতদিন তোমার হাতের রান্না খাইনি !

পিসিমা বললেন, হায় আমার পোড়া কপাল ! আমার কি আর সে শক্তি আছে রে ! নিজে আর রান্নাঘরে যাই না। দুই বৌমাই রেঁধেছে, তুই ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক ভালবাসতিস।

তোমার হাঁটুতে ব্যথা, তুমি চিকিৎসা করাও না কেন, পিসিমা ?

ওষুধ তো খাই, সারে না।

তুমি বম্বেতে আসবে ? ওখানে খুব ভাল চিকিৎসা হয়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো।

দূর আমি এখন আর কোথায় যাবো ! মাঝে মাঝে কমে যায়। ও নিয়ে তুই ভাবিস না। তুই যে ঐ কথাটা বললি তাতেই আমি কত খুশি হলাম। হ্যাঁরে, তোদের কাজে খুব খাটনি, তাই না ? তোর তো দেখছি চোখের নিচে কালি !

পলাশের দু'চোখ জ্বালা করে এলো। এমন স্নেহের স্বরের একটা প্রচণ্ড ঝাপটায় সে কয়েক মুহূর্ত অভিভূত ভাবে চুপ হয়ে গেল। এই দিকটা কেউ ভেবে দেখে না। সবাই ভাবে, সে কত টাকা রোজগার করছে ! লাখ লাখ টাকা ! কিন্তু এই কাজে যে কত খাটুনি, কখনো সারারাত টানা শুটিং থাকে, চড়া আলোর সামনে কৃত্রিম হাসি কান্না·· এক এক সময় শরীর আর বইতে চায় না, সে কথা কেউ বোঝে না। পিসিমা বুঝেছেন !

পিসিমা পলাশের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

ধীরুদা বলল, এখন তো শুনছি বম্বেতে অনেক স্টারের বাড়িতে ইনকামট্যাক্স রেইড হচ্ছে, তোর বাড়িতেও হয়েছে নাকি রে বিলু ?

পলাশ মুখে কিছু না বলে দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাজলই যেন এখন পলাশের প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে গেছে। পলাশ যখন এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তখন কাজল বেশ ছোট ছিল,

পলাশের সাধারণ চেহারাটা তার মনে নেই। ছবির মানুষ পলাশের সে ভক্ত।

সে তার বড়দার কথার উত্তরে বলল, তুমি জানো না বড়দা, পলাশদা কত দান-ধ্যান করে। আজকের কাগজেই তো বেরিয়েছে, উনি কান্সার হাসপাতালে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছেন। তারপর বন্যাত্রাণের জন্য···

ধীরুদা বলল, ওসব ট্যাক্স ফাঁকি দেবার একটা রাস্তা!

তাহলে অন্যরা দেয় না কেন?

ধীরুদার কথার বাঁকা সুর এখন পিসিমা পর্যন্ত লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, ওসব কথা ছাড়তো! যার মন ভাল, সেই-ই অন্যদের দেয়। পিলুর মনটা কত নরম তা তো আমি জানি! আরও দিস, পারলে গরিব মানুষদের জন্য আরও কিছু দিস, পিলু। মানুষকে দিয়ে-থুয়ে ভোগ করলে বেশি আনন্দ হয়! তোর মা এখন কোথায় রে পিলু?

জামশেদপুরে, আমার ভাইয়ের কাছে থাকেন! আমি গত মাসে দেখা করে এসেছি, বিহারের জঙ্গলে একটা শুটিং ছিল!

কাজল ব্যগ্রভাবে বলল, কী বই! কী বই পলাশদা!

এখনও নাম ঠিক হয়নি।

সেকি, নাম ঠিক না করেই শুটিং আরম্ভ হয়ে যায়?

ধীরুদা বলল, নাম তো যে কোনো একটা দিলেই হল। ঐসব হিন্দি ফিল্মের সব গল্পই তো এক। খানিকটা মারামারি, খানিকটা কান্না, খানিকটা ধেই ধেই নাচ।

এবারে পলাশ চট করে জিজ্ঞেস করল, আপনিও হিন্দি ছবি দেখেন নাকি, ধীরুদা?

কস্মিন কালেও না! তবে টি. ভি-তে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

কাজল বলল, বড়দা, তুমি দিল-কা-দুশমন পুরোটা দেখেছ! সেটাতে পলাশদা ছিল।

দেখলুম পিলু কী রকম লাফালাফি করতে শিখেছে।

পলাশ ভাবল, ধীরুদার সব কথায় কি ব্যঙ্গ না ঈর্ষা ঝরে পড়ছে? তার ওপর ধীরুদার রাগ আছে। ধীরুদা সেই সময়

পলাশকে বেশি করে রাজনীতিতে জড়াতে চেয়েছিল। কিছু কিছু বিপজ্জনক কাজও করিয়েছে। ধীরুদা বলেছিল, তুই ফুল টাইমার হয়ে যা, তারপর পুলিশের হাত থেকে পার্টিই তোকে প্রোটেকশান দেবে!

পলাশ সে কথা শোনেনি। সে পালিয়ে গিয়েছিল পুনায়।

কিন্তু ধীরুদার নিজের দু'ভাই, ছেলেমেয়েরা কী করছে? তারাও তো সাধারণ চাকরি করে, বিয়ে করে, ঘর-সংসার সাজিয়ে গেরস্থ হয়ে আছে। তাদের রাজনীতিতে ভেড়াতে পারেনি ধীরুদা?

পলাশ ঠিক করেছে আজ এখানে এসে রাগারাগি করবে না। একটাও অপ্রীতিকর কথা বলবে না। ধীরুদা যতই তাকে খোঁচাবার চেষ্টা করুক!

পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য সে বলল, আজ এখানে আসবার সময় দর্পণা সিনেমাহলটা দেখে অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। কতদিন ঐ হলে টিকিট কাটার জন্য লাইন দিয়েছি। পিসিমা, তোমার জন্যও তো টিকিট কেটে এনে দিয়েছি! ঐ হলের মালিক আমাকে বুকিং কাউণ্টারে চাকরি দেবে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত দেয়নি!

কাজল বলল, এখন এই দর্পণাতে তোমার কোনো ছবি এলে টিকিট ব্ল্যাক হয়, আমরাই টিকিট পাই না! টি. ভি. সেটটা কেনার আগে মা তো তোমার কোনো ফিলমই দেখেনি।

ধীরুদা ভুরু কুঁচকে বলল, কিন্তু তোরা যাই-ই বলিস পিলু, তোদের এই হিন্দি সিনেমাগুলো ডেফিনিটলি অপসংস্কৃতি! দেশের অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের মন বিগড়ে দিচ্ছে।

পলাশ বলল, তবে কেন তোমাদের চিফ মিনিস্টার আমাদের দিয়েই···

পলাশের কথাটা শেষ হল না, দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা পড়ল। সাধারণ ধাক্কা নয়, শব্দটার মধ্যে কর্তৃত্বের জোর আছে।

কাজল উঠে দরজা খুলে দিল।

একজন পুলিস অফিসার ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়েছে। টুপিটা খুলে সে পলাশের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, বাইরের ভিড় ম্যানেজ·

করা যাচ্ছে না। ক্রাউড আনকন্ট্রোলেবল্ হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়ির মধ্যে এত লোক ঢুকতে অ্যালাউ করা হয়েছে, সেই জন্যই তো বাইরের লোক খেপে গেছে। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে স্যার।

পলাশ কড়া গলায় বলল, আমি আমার একজন আত্মীয়ের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে এসেছি। রাস্তায় কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সামলানোর দায়িত্ব আপনাদের!

অফিসারটি বিগলিত ভাবে বলল, সে তো নিশ্চয়ই। আপনি শুধু একটিবার···মানে ভেতরে এত লোক ঢুকে পড়েছে তো, তাই পাবলিক চাইছে···আপনি শুধু একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান, তারপর আমি ক্রাউড ডিসপার্স করে দেবো।

বিরক্তি ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে পলাশ বলল, আমি ঠিক এক মিনিট দাঁড়াব।

তাতেই হবে স্যার!

কাজল দৌড়ে গিয়ে খুলে দিল বারান্দার দিকের দরজাটা। কোনো দরকার নেই, তবু সে পলাশের হাত ধরে নিয়ে বলল, সেও পলাশের পাশে দাঁড়াবে।

ধীরুদা পুলিস অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি ওকে স্যার স্যার বলছেন কেন?

একটুও লজ্জা না পেয়ে অফিসারটি বলল, আমি ওনার খুব ভক্ত।

কথাটা শুনতে পেয়ে পলাশ বিশেষ আত্মপ্রসাদ অনুভব করল। এগারো বছর আগে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে এই অফিসারটির মতনই কেউ একজন তাকে রুল দিয়ে পেটাতো। গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিত। এখন টুপি খুলে স্যার বলছে। ধীরুদা যতই হিংসে করুক তাকে, এক সময় যারা তাকে পাত্তা দিত না, যারা অপমান করতো, আজ তারাই পলাশকুমারকে খাতির করে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই তুমুল একটা অট্টরোল ভেসে এলো নিচ থেকে। পলাশ এক নজরে হিসেব করে নিল, অন্তত হাজার

দু'এক তো হবেই। রাইটার্স'বিল্ডিংসে যখন গিয়েছিল, তখন সব কর্মচারীরা ছুটে এসেছিল কাজ বন্ধ করে, অথচ ঐ রাইটার্স'-বিল্ডিংসেই সে একটা কেরানির চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরেছে এক সময়। মানুষ এক জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী চাইতে পারে?

উল্টোদিকের হলুদ বাড়িটার দিকে তাকাল সে। এখনো জানলা বন্ধ তিনতলার। একতলা, দোতলার সব দরজা-জানলা খোলা, সেখানে ভিড় করে আছে মানুষ। তিনতলার ওরা খবর পায়নি? রাস্তায় এত চিৎকার তবু ওরা কৌতূহলী হয়ে জানলা খুলে দেখবে না? ইচ্ছে করে জানলা বন্ধ করে রেখেছে।

কী নাম ছিল মেয়েটার? মল্লিকা না বল্লরী? ঠিক মনে নেই? হিস্ট্রিতে এম. এ. পড়তো তখন। তার বিয়ে হয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেছে। ওদের বাড়িতে অন্য কেউ নেই? সেই এগারো বছর আগে, পলাশ এই বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, মল্লিকা কিংবা বল্লরী নামের সেই মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি হলে জানলা বন্ধ করে দিত। রাস্তায় একদিন ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিল পলাশ, ভুরু তুলে নিঃশব্দ ধমক দিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। পলাশকে অশিক্ষিত মনে করতো মেয়েটা। কাকে যেন বলেছিল···

ইচ্ছে করে ওদের বাড়ির লোক জানলা বন্ধ করে রেখেছে। কিসের এত অহংকার ওদের? পলাশ ইচ্ছে করলে কালই ঐ বাড়িটা কিনে, ভেঙে ফেলে, ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে। কত দাম হবে বাড়িটার, পাঁচ লাখ, সাত লাখ?

রাস্তার ছেলেমেয়েরা শিস দিচ্ছে, কতরকম নাম ধরে ডাকছে তাকে, কেউ কেউ ঠোঁটে হাত দিচ্ছে, কয়েকজন ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুলের মালা। অসংখ্য মানুষ এখন তাকে ভালবাসে। শুধু একটা বাড়ির জানলা বন্ধ, তাতে কী আসে যায়? মল্লিকা কিংবা বল্লরীর চেয়ে এক হাজার গুণ সুন্দরী মেয়েরা তার পায়ে লুটোবে, কত এম. এ. পাশ ছেলেমেয়ে তার কাছে সামান্য একটা সুযোগ পাবার জন্য আসে···

তবু পলাশ ঐ বন্ধ জানলার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না!

ব্যর্থ প্রেমিক

আহত বাঘ যেমন নিজের ক্ষতস্থানটা বার বার চাটে, সেই রকমই মণিময় তার দুঃখগুলোকে ভালবাসে। কখনও একলা হয়ে পড়লেই সে তার নিজের দুঃখগুলোকে আদর করে।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা, অফিস থেকে বেরিয়ে এসে মণিময় দাঁড়িয়ে আছে মনুমেন্টের কাছে। এরপর সে কোথায় যাবে জানে না। এই জায়গাটা থেকে অনেক রকম বাস ছাড়ে, মিনিবাস দাঁড়ায়, শেয়ারের ট্যাক্সিও পাওয়া যায়, অর্থাৎ এখান থেকে কলকাতার যে-কোনো জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মণিময় মনস্থির করতে পারে না। পর পর দুটি সিগারেট সে শেষ করল। প্রায় প্রত্যেক দিনই অফিস থেকে বেরিয়ে মণিময়ের এরকম হয়।

কোথায় সে এখন যাবে?

মণিময়ের একটা বাড়ি আছে, সেখানে মা-বাবা, দুই ভাই, তিন বোন নিয়ে বেশ বড় সংসার। মণিময়ের আছে নিজস্ব একটা ঘর। তাদের বাড়িতেও বিশেষ অশান্তি নেই, সব সময় বেশ একটা হৈ-চৈ ভাব। মণিময় তো অন্য আর সবার মতন বাড়িও ফিরে যেতে পারে, স্নান করে জলখাবার খাবে, তারপর একটা বই নিয়ে বসবে, কিংবা রেডিও শুনবে, কিংবা গল্পে মেতে যাবে। যা সবাই করে। আবার সে তো একটা সিনেমাও দেখতে পারে। একা যেতে না পারে, সঙ্গীরও অভাব নেই। তার বোনেরা প্রায়ই তাকে সিনেমা দেখাবার জন্য আবদার করে। তাদের পাড়াতেই থাকে বাসবী, তার মেজ বোনের বান্ধবী। বাসবী প্রায়ই আসে তাদের বাড়িতে এবং মণিময়ের দিকে এমনভাবে তাকায় যে বোঝা যায় মণিময়ের প্রতি তার একা মুগ্ধতার ভাব আছে। বাসবীকে তো দেখতে সবাই ভালোই বলে, মেয়েটি পড়াশোনাতেও ভালো, এ বছর থেকে রিসার্চ করছে কেমিস্ট্রিতে। এই বাসবীর সঙ্গে মণিময় কি প্রেম করে

সন্ধেগুলো কাটাতে পারে না? একদিন তো মণিময় তাদের বাড়ির ছাদের আলসের কাছে দাঁড়িয়ে বাসবীকে বলেছিল, তোমার হাতের আঙুলগুলো খুব সুন্দর। এরপর আরও তো অনেক কিছু বলার থাকে।

মণিময় একেবারে নির্বান্ধবও নয়। তার বেশ কয়েকজন কলেজ-জীবনের বন্ধু ছড়িয়ে আছে কলকাতার নানা প্রান্তে, তাদের অনেকের বাড়িতেই এ সময় গেলে আড্ডা দেওয়া যায়।

মণিময় সেরকম কোনো জায়গাতেই গেল না। সে একটা মিনি-বাস ধরে চলে এল নিউ আলিপুরে। পেট্রোল-পাম্পের কাছে নেমে হাঁটতে লাগল মন্থরভাবে। যেন এখনও সে জানে না কোথায় যাবে। মিনিট সাতেক হাঁটার পর সে একটা চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে থমকে দাঁড়াল। সন্ধে এখন গাঢ় হয়ে এসেছে, কিন্তু আকাশে একটাও তারাও নেই। ওপরে তাকালে দেখা যায় গর্ভিণী মেঘ। ফ্ল্যাট-বাড়িটার সব ঘরেই আলো জ্বলছে। বেশ পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে চেহারা বাড়িটার। মণিময় একটুক্ষণ দ্বিধা করে তারপর বাড়িটার ভেতরে ঢুকল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল চারতলায়। বেশ খাড়া সিঁড়ি, চারতলায় উঠতেই হাঁপিয়ে যেতে হয়। মণিময় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে দম নিল।

দু'পাশে দুটি ফ্ল্যাট। একই রকম দরজা, একই রকম কলিং বেল। তবে দুটি আলাদা নাম লেখা। মণিময় ডান দিকের দরজার সামনে এসে বেল টিপল। সামান্য একটুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, দরজা খুলে দিল একটি বাচ্চা চাকর।

দরজা থেকেই বসবার ঘরটা দেখা যায়। সুন্দর সোফা-সেট দিয়ে সাজানো। একটি সোফার ওপর পা মুড়ে বসে আছে অনিতা, হাতে একটি পাতলা বই, সে কৌতূহলে তাকিয়ে আছে দরজার দিকেই।

মণিময় সরু করিডরটা পেরিয়ে বসবার ঘরে চলে এল। অনিতা উঠে দাঁড়াল না, কোনো কথা বলল না, শুধু চেয়ে আছে তার দিকে।

মণিময় জিজ্ঞেস করল, ভালো আছ?

অনিতা ঘাড় হেলিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

মণিময় জানে, অনিতা নিজে থেকে তাকে বসতে বলবে না। সে শুধু শান্তভাবে চেয়েই থাকবে একদৃষ্টে।

মণিময় নিজেই বসল। ফ্ল্যাটটা ফাঁকা এবং নিঃশব্দ, সেই নৈঃশব্দ্য অনুভব করে মণিময় আবার জিজ্ঞেস করল, অরূপ বাড়ি নেই ?

অনিতা বলল, না।

অনিতার ভুরু সামান্য কুঁচকে এসেছে। মণিময় খুব ভালো করেই জানে, অরূপ এসময় বাড়ি থাকে না। অরূপ একটি বিদেশী বিমান কোম্পানিতে কাজ করে, তাকে সপ্তাহে তিনদিন এই সময় এয়ারপোর্টে থাকতে হয়। বাড়ি ফিরতে রাত দশটা তো বাজবেই।

হাতের বইটা নামিয়ে রাখল অনিতা। পাতলা চটি বই, আকাশী রঙের মলাট।

মণিময় লক্ষ্য করে দেখল, ওটা একটা কবিতার বই। একলা সন্ধেবেলা অনিতা একটা কবিতার বই পড়ছিল। অনিতাকে এসব মানায়। অন্য মেয়েরা এসময় সিনেমা পত্রিকার পাতা ওল্টায় কিংবা পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে যায়। কিন্তু অনিতার রুচি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, কবিতা কিংবা গানে সে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে।

মণিময় বলল, অরূপ একদিন আসতে বলেছিল, তাই এলাম!

কথাটা একদম মিথ্যে নয়। অথচ সত্যি তাও নয়, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহই নেই। অরূপ একদিন মণিময়কে আসতে বলেছিল ঠিকই। অরূপ আর অনিতার সঙ্গে মণিময়ের একদিন নিউ মার্কেটের কাছে দেখা। অরূপের সঙ্গে মণিময়ের মোটামুটি পরিচয় আছে, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের ছাদের হলে তাদের একই সঙ্গে পরীক্ষার সিট পড়েছিল। অনিতার কিছু ব্যস্ততা ছিল বলে সেদিন নিউ মার্কেটের সামনে অরূপ বেশিক্ষণ কথা বলতে পারেনি মণিময়ের সঙ্গে। সে বলেছিল, একদিন এস না আমাদের বাড়িতে, গল্প করা যাবে।

এটা নিতান্ত কথার কথা। এরকম নেমন্তন্নে হঠাৎ কেউ কারুর

বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় না। তাও বেছে বেছে মণিময় ঠিক এমন সময়েই এসেছে, যখন অরূপ বাড়িতে থাকে না।

অনিতা এবার উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে?

মণিময় বলল, খেতে পারি।

বাড়িতে নিশ্চয়ই রান্নার লোক আছে। অনিতা তো সেখান থেকেই জোরে চায়ের কথা বলে দিতে পারত। তা বলল না। নিজেই চলে গেল. তারপর অনেকক্ষণ আর এল না। খানিকবাদে বাচ্চা চাকর এসে চা দিয়ে গেল, তবু অনিতার দেখা নেই।

মণিময় একটু হাসল। অনিতা বুঝিয়ে দিতে চায় যে মণিময় এখানে অবাঞ্ছিত। অতিথিকে একলা বসিয়ে রেখে নিজে অন্য জায়গায় থাকার মতন অভদ্র তো অনিতা নয়। সে ইচ্ছে করেই মণিময়কে এরকম অপমান করল!

আর কোথাও, কেউ মণিময়কে এরকম অবহেলা বা অপমান করে না। তার স্বাস্থ্য ভালো, চেহারা সুন্দর, এককালে খুব নাম-করা ছাত্র ছিল, এখনও সে অরূপের চেয়ে কিছু খারাপ চাকরি করে না, সে কথাবার্তাও ভালো বলতে পারে, কোথাও অযথা বকবক করে অন্যদের বিরক্তি সৃষ্টি করে না। অন্য অনেক জায়গাতেই সন্ধে-বেলা মণিময় খাতির পেতে পারত, কিন্তু তবু সে এখানে ইচ্ছে করে অপমান সহ্য করতে এসেছে।

একটু পরে অনিতা এসে জিজ্ঞেস করল, তোমায় চা দিয়েছে?

—তুমি ভালো আছ, অনিতা?

অনিতা এবার স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে উঠল। ঝংকার দিয়ে বলল, তুমি বার বার একথাটা জিজ্ঞেস কর কেন বল তো? হ্যাঁ আমি ভালো আছি, নিশ্চয়ই ভালো আছি, খারাপ থাকব কেন? তুমি চাও, আমি খারাপ থাকি?

মণিময় শুকনো গলায় বলল, না আমি তা চাই না। সত্যি চাই না।

—মণিদা, আমাকে এখন একটু বেরোতে হবে।

—কোথায় যাবে? চল আমি তোমাকে পেঁৗছে দিচ্ছি।

—না, আমি যাব নিচের ফ্ল্যাটে। টেলিভিশনে আটটার সময়

একটা ভালো প্রোগ্রাম আছে। সেটা দেখব।

—টেলিভিশনের প্রোগ্রাম? সেটা না দেখলে হয় না আজ?

—আমি ওদের বলে রেখেছি, আমি না গেলে ওরা ডাকতে আসবে।

মণিময় বুঝতে পারে, এটা একটা অতি সামান্য ছুতো। অনিতা তাকে চলে যেতে বলছে, এর থেকে ভদ্রভাষা আর কী হতে পারে? অনিতা কি তার সামনে বসতে ভয় পায়, না বিরক্ত হয়!

কিন্তু মণিময়ও এর চেয়ে বেশি অভদ্র হতে পারে না। একথা বলার পর মণিময়ই বা আর কী করে বসে থাকবে? এক্ষুনি তার চলে যাওয়া উচিত।

সে উঠে দাঁড়াল। তার মুখে কোনো ব্যথার চিহ্ন নেই, বরং একটা পাতলা চাপা হাসি। সে তো এরকম অপমান পাওয়ার আশা করেই এসেছিল। সে জানত, অনিতা ঠিক এরকম ব্যবহার করবে।

মণিময় বলল, অরূপের সঙ্গে দেখা হল না।

অনিতা মণিময়কে উঠে দাঁড়াতে দেখে খুশি হয়েছে। সে বলল, ওর সঙ্গে দেখা করতে হলে রবিবার আর বৃহস্পতিবার—ঐ দু'দিন ও বাড়িতেই থাকে।

—অরূপকে বলো, আমি এসেছিলাম। অনিতা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল না। মণিময় একাই বেরিয়ে এসে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিল। অনিতা তখনও বসবার ঘরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে। অন্য অনেক মেয়েই এই অবস্থায় ঝগড়া করত কিংবা খারাপ কথা বলত। অন্য কেউ অনায়াসেই বলতে পারত, মণিদা, আমি চাই না তুমি এরকম ভাবে আমার বাড়িতে আসো। আমি চাই না, তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে গায়ে পড়ে বেশি ভাব করতে যাও! কেন তুমি আমাদের জীবনে অশান্তি এনে দিতে চাইছ? তুমি ফের এরকমভাবে এলে আমি চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করব!

কিন্তু অনিতা এরকম কথা কোনোদিন মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবে না। তার রুচি অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যবহার খুব মার্জিত। সে আকারে ইঙ্গিতে মণিময়কে এই সব কথা বোঝাতে

চায়, কিন্তু মুখে কোনো কটু কথা বলবে না। এক সময় সে মণিময়কে ভালবাসত, এখন ভালো না বাসুক, ভদ্রতাটুকু মুছে ফেলতে পারবে না কিছুতেই। মণিময় সেই ভরসাতেই তো এখানে এসেছে।

অন্য কোনো লোক হলে মণিময় যে কথাটা জানবার জন্য বার বার অনিতার সঙ্গে দেখা করতে চায়, সেটা সোজাসুজি জিজ্ঞেস করত। কিন্তু মণিময় তা পারে না। সে আশা করে থাকে, অনিতা নিজেই তা বলবে।

মণিময় যখন বাড়ি ফিরল, তখন তাদের বাইরের ঘরে তুমুল আড্ডা জমিয়েছে ভাই-বোনেরা। বাসবীও আছে সেখানে। সে ঢুকতেই তার ছোটবোন বলল, সেজদা তুমি এইখানে, এই জায়গাটায় এসে একটু পাশ ফিরে দাঁড়াও তো!

—কেন, কেন?

—দাঁড়াও না, একবার।

তার বোন নিজে মণিময়ের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে মুখটা এক-পাশে ঘুরিয়ে দিল। তারপর বলল, এই দ্যাখ, বলছিলাম না সেজদার মুখের সঙ্গে অমিতাভ বচ্চনের অনেকটা মিল আছে! দ্যাখ, এ পাশ থেকে দ্যাখ! বাসবী বলল, সত্যিই তো!

মণিময় ওদের সঙ্গে আড্ডায় যোগ দিয়ে সেখানেই বসে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে শুনতে লাগল ওদের কথা। এখানে বেশ আনন্দময় পরিবেশ। এরা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, একটু আগেই মণিময় কতখানি অপমান সয়ে এসেছে। এরা কেউ বিশ্বাসই করবে না যে মণিময়কে কেউ অপমান করতে পারে।

শুধু অনিতা পারে। সেই কথাই খানিকটা বাদে, নিজের ঘরে এসে একা একা শুয়ে থেকে মণিময় ভাবছিল। এ জীবনে এ পর্যন্ত আর কেউ মণিময়কে এরকম আঘাত দেয়নি। অনিতা আজও হয়তো জানে না, সে মণিময়ের কতখানি ক্ষতি করেছে। মণিময় আর কিছুতেই সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারছে না। সেই কলেজ-জীবন থেকেই বন্ধুবান্ধবরা সবাই জানত, মণিময় অনিতাকে বিয়ে করবে। প্রতিটি বিকেল দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে

বেড়াত। বোটানিক্যাল গার্ডেন, বালিগঞ্জ লেক, দক্ষিণেশ্বর— এইসব জায়গায় ওদের পাশাপাশি বসে থাকার ছবি, মণিময়ের মধ্যে এখনও একটু ম্লান হয়নি।

অনিতার সঙ্গে মণিময়ের আলাপ হয়েছিল খুব সামান্য ঘটনা থেকে। তার বন্ধু শুভেন্দুর বাড়িতে মণিময় প্রথম অনিতাকে দেখে। শুভেন্দুর বোনের তিন চার-জন বান্ধবী এসেছিল সেদিন, তার মধ্যে অনিতা একজন। এমনিই ভদ্রতার আলাপ হয়েছিল। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়নি। কিন্তু এর ঠিক পরের দিনই অনিতার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় আকস্মিকভাবে। প্রবল বৃষ্টির দিন ছিল সেটা, রাস্তাঘাট ভেসে যাচ্ছে, তার মধ্যে মণিময় অতিকষ্টে একটা ট্যাক্সি যোগাড় করে বাড়ি ফিরছিল, পার্ক স্ট্রিটের কাছে দেখল অনিতা দাঁড়িয়ে আছে, সর্বাঙ্গ ভেজা। ঠিক আগের দিনই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় হলেও তাকে চিনতে একটু দেরি হয়েছিল মণিময়ের। শুধু মনে হয়েছিল চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছে। অনিতার সঙ্গে চোখাচোখি হতে অনিতা নিজেই চেনা-ভাবে হাসল তখন মনে পড়ে গেল মণিময়ের। এই রকম অবস্থায় একটি মেয়েকে দেখলে তাকে লিফ্‌ট দেওয়াই ভদ্রতা। তবু মণিময় নিজে থেকে সে কথা বলতে একটু লজ্জা পেল, ট্যাক্সিটা অনিতাকে ছাড়িয়ে চলে গেল। তারপর মণিময়ের মনে হল আজ ট্রাম-বাসে চড়া খুবই কঠিন ব্যাপার, ট্যাক্সিও পাওয়া খুব শক্ত, এইরকম সময় সে পরিচিত একটি মেয়েকে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে দেখেও চলে যাচ্ছে! ট্যাক্সি থামিয়ে সে নিজেই নেমে দৌড়ে এসে অনিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি কোন দিকে যাবেন?

সেদিন যদি মণিময় এভাবে ট্যাক্সি থামিয়ে ফিরে না আসত, তা হলে অনিতার সঙ্গে তার গভীর পরিচয় হতই না কোনোদিন, তার জীবনটা এরকম বদলে যেত না। এক একটা মুহূর্তে মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যায়।

সেদিন ট্যাক্সিতে অনিতাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া যায়নি। ভবানীপুরের কাছে রাস্তায় প্রায় এক কোমর জল, সেখানে ট্যাক্সি আটকে গেল। দু'জনকেই নেমে পড়তে হল সেখানে।

তারপর জলের মধ্যেই প্যাণ্ট আর শাড়ি ভিজিয়ে হাঁটতে লাগল দু'জনে. তাতেই ওরা খুব কাছাকাছি এসে গেল। অনিতা দেখতে যে দারুণ একটা সুন্দরী তাও নয়, সাধারণভাবে সুশ্রী বলা যায়। কিন্তু মণিময় দেখেছিল, অনিতার রুচি বা কথাবার্তার ধরনের সঙ্গে তার একটা মিল আছে। দু'জনেই একই ধরনের বই পড়তে ভালবাসে।

প্রায় চার বছর ওরা দু'জনকে তীব্রভাবে ভালবেসেছে। অনিতা নিজেই দু'তিন দিন মণিময়ের সঙ্গে দেখা না হলেই ছটফট করত। মণিময়ের বুকে মাথা রেখে বলত, তুমি কোনোদিন আমাকে ভুলে যাবে না. বল!

নিজের বাড়িতে অনিতার কথা গোপন করেনি মণিময়! শেষের দিকে একদিন অনিতাকে বাড়িতে নিয়েও এসেছিল। তাদের বাড়ির লোকজন অনিতার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছে। মণিময় নিজের পছন্দ মতন কারুকে বিয়ে করলে তাদের বাড়ি থেকে কোনোরকম আপত্তি ওঠবার কথা নয়। তাদের বাড়ির আবহাওয়াই সে রকম। মণিময়ের মা পরে অনিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, মেয়েটি বেশ! খুব নম্র, চমৎকার ব্যবহার।

অনিতাও মণিময়দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলেছিল, তোমাদের বাড়ির সবাই কী চমৎকার! তোমার মা, কী সুন্দর চেহারা, ঠিক একটা মা-মা ভাব আছে, আর তোমার ভাইবোনেরা এত ভালো. একটু আলাপেই কত আন্তরিক ব্যবহার করল। তোমার ভাইবোনেরা তোমাকে খুব ভালবাসে, তাই না?

মণিময় বলেছিল, হ্যাঁ, ভাইবোনেরাই আমার বন্ধুর মতন।

এর পরদিন থেকেই অনিতা মণিময়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিল। চিঠি লিখলেও কোনো উত্তর দেয়নি। শুধু বিস্মিত নয়, মণিময় একেবারে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল বলা যায়। গণ্ডগোলটা কোথায় হল? তার বাড়ির লোকেরা অনিতাকে পছন্দ করেছে, অনিতার ভালো লেগেছে সবাইকে। তবু কেন অনিতা ঠিক এর পর থেকেই দূরে সরিয়ে দিল মণিময়কে? কেন সব ভালবাসা মিথ্যে হয়ে গেল? মণিময় আগে কোনোদিন অনিতাদের বাড়িতে যায়নি।

অনিতা নিয়ে যেতেও চায়নি। সে বলেছিল তার বাবা একটু কড়া ধরনের, তিনি পছন্দ করবেন না। তবু প্রায় সাত-আটখানা চিঠি লিখেও অনিতার উত্তর না পেয়ে মণিময় একদিন গিয়েছিল অনিতাদের বাড়ি। অনিতার দেখা পায়নি, একটি চাকর এসে বলেছিল, অনিতা বাড়ি নেই, কিন্তু মণিময়ের সন্দেহ হয়েছিল, সেটা মিথ্যে কথা, অনিতা নিজেই দেখা করতে চায় না। অনিতা কেন এমন অপমান করতে চাইল তাকে, তার দোষটা কোথায়? অনিতা কি তার বাবাকে এতখানি ভয় পায়? এত ভয়ের কী আছে? মণিময়েরও কোনোও অযোগ্যতা নেই, এমন কি জাতের পর্যন্ত মিল আছে!

এরপর আট মাস পরে সে পেয়েছিল অনিতার বিয়ের চিঠি, এবং অরূপের সঙ্গে অনিতাদের জাতের মিল নেই। তাহলে, মণিময়ের বদলে অরূপকে বিয়ে করতে গেল অনিতা? চার বছরের মধ্যে তো সে একদিনও অরূপের কথা শোনেনি? অনিতা অরূপের কথা কি গোপন করে গিয়েছিল? না, তা হতেই পারে না। অনিতা মিথ্যে কথা বলে না, কোনওরকম লুকোচুরি সে পছন্দ করে না। অনিতার ভালবাসার মধ্যে কোনও গলদ ছিল না। তবু সে এরকম অদ্ভুত ব্যবহার করল কেন?

ব্যর্থ প্রেমে মণিময় পাগল হয়ে যায়নি। সে জানে, একটি মেয়েকে বিয়ে করতে না পারলে কারুর জীবন ব্যর্থ হয়ে যায় না। সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। সে আবার অন্য কারুকে ভালবেসে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারে। কিন্তু তার আগে তার শুধু জানা দরকার। অনিতা তাকে অপমান করতে চায়, করুক, দেখা যাক, অপমানের কোন্ চরম সীমানায় সে যেতে পারে। এবং কেন? আবার মণিময় গেল অনিতার ফ্ল্যাটে। দরজা খুলে অনিতা ভুরু কোঁচকাল, মণিময়কে ভেতরে এসে বসতে পর্যন্ত বলল না।

ঠোঁটে পাতলা হাসি টেনে মণিময় বলল, আমি আবার এসেছি। অরূপ নেই?

অনিতা বলল, তোমাকে তো আমি বলেইছি, এরকম সন্ধের সময় অরূপ বাড়ি থাকে না।

কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। তুমি বলেছিলে রবি আর বৃহস্পতিবার সে থাকে!

তা অবশ্য ঠিক! বৃহস্পতিবার অরূপ বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজ একটা জরুরি কাজে তাকে এয়ারপোর্ট যেতে হয়েছে, অরূপ অফিস থেকে খবর পাঠিয়েছে। মণিময় এক পা দরজার ভেতরে রাখল। সে দেখতে চায় অনিতা তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে কি না। অনিতা কি এতদূর যাবে?

অনিতা অবশ্য তা পারল না। দরজার কাছ থেকে সরে এল। মণিময় জিজ্ঞেস করল, আমি একটু বসব? অরূপ যদি একটুক্ষণের মধ্যে ফেরে! অনিতা বলল, অরূপের সঙ্গে তোমার হঠাৎ কোনো দরকার আছে?

সোফার ওপর বসে পড়ে মণিময় বলল, না। আমি অরূপের সঙ্গে দেখা করতে আসি না! আমি তোমাকেই দেখতে আসি—

অনিতা কিছু বলতে যাচ্ছিল, মণিময় তাকে বাধা দিয়ে বলল, তুমি কি ভেবেছিলে আমি কোনো খারাপ লোকের মতন, তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অরূপকে আমাদের পুরনো সব কথা বলে দেব? অরূপকে জানিয়ে দেব যে গঙ্গায় নৌকার ওপর তুমি চুমু খেয়েছিলে। তুমি আমাকে একরম খারাপ লোক ভাব!

—না, তা অবশ্য ভাবি না।

—আমি তোমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় আজ একঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলাম। অরূপকে ফিরতে দেখিনি বলেই তোমার কাছে এসেছি।

—তুমি চা খাবে?

—না। আজ তোমার কোনো টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখতে যাবার কথা নেই? অরূপ নিজেই টেলিভিশন সেট কেনে না কেন?

—আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এখন এভাবে দেখাশোনা করা আমাদের উচিত নয়।

—অর্থাৎ তুমি ভয় পাচ্ছ! এখন যদি অরূপ হঠাৎ এসে পড়ে, সে ভাববে, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে প্রেম করছ!

—মণিদা!

—তুমি আগে আমাকে শুধু মণিময় বলে ডাকতে, এখন দাদা বল।

—আমি অনুরোধ করছি, তুমি পুরনো সব কথা ভুলে যাও!

—তোমার ভয় নেই, আমি তোমার সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম কিংবা ব্যভিচার করতে চাই না। ওসব আমার চরিত্রে নেই। এখন পুরনো কথা ভুলে যেতে বলছ। অথচ একদিন তুমিই বলেছিলে তোমাকে যেন আমি ভুলে না যাই!

—আমি ক্ষমা চাইছি।

মণিময় এমন ভাবে উঠে দাঁড়াল, যেন তক্ষুনি সে অনিতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনিতার দিকে। সে.সহ্যের শেষ সীমায় এসে গেছে। চাপা গলায় প্রায় গর্জন করে সে বলল, আগে বল, কেন? কেন তুমি আমাকে অপমান করলে?

অনিতা মুখ নিচু করে বলল, অপমান করতে চাইনি। আমি তোমার অযোগ্য বলে সরে এসেছি।

—কিসের তুমি অযোগ্য? চার বছর আমরা একসঙ্গে ছিলাম!

—তখন আমি বুঝতে পারিনি। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, তোমাকে পাব, সেই স্বপ্নে আর সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ একদিন ঘোর ভাঙল, আমি বুঝতে পারলাম তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না! আমি তোমার সম্পূর্ণ অযোগ্য!

—কেন? সেটাই তো জানতে চাইছি।

—তুমি শুনবেই?

—না শুনে আজ আর আমি যাব না এখান থেকে।

—তবে শোন। আমার যখন চার বছর বয়স, তখন আমার মা আমার বাবার এক বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে যান। আমার বাবা একটি নার্সকে রক্ষিতা রেখেছে। সে-ই আমাদের বাড়ির কর্ত্রী। আমার পরিচয় এরকম কালি মাখা, তোমাকে কখনও বলতে পারিনি।

মণিময়ের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার মনে হল, আজ এই কথা বলে অনিতা তাকে যা অপমান করল, সে রকম বেশি অপমান আগেও করেনি। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল, অরূপ

এসব জানে ?

—হ্যাঁ।

—অনিতা তুমি ভাবলে যে অরূপ এসব জেনেও তোমাকে বিয়ে করতে পারে, আর আমি পারতাম না ? আমার মধ্যে সেটুকু উদারতা নেই ? আমি তোমার সামাজিক পরিচয়টা এত বড় করে দেখতাম ! এতদিন আমার সঙ্গে মিশে আমাকে তুমি এই চিনেছ ?

—আমি জানতাম, তোমার সে উদারতা আছে। কিন্তু সেই উদারতার সুযোগ নিলে সেটা হতো আমার পক্ষে দারুণ স্বার্থ-পরতা। সেটা আমি কবে বুঝেছিলাম জান ?

—কবে ?

—যেদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তোমাদের বাড়ির সব লোক এত ভালো, এমন একটা আনন্দময় পরিবেশ—সে বাড়িতে বৌ হয়ে গিয়ে আমি নিজেকে কিছুতেই মানাতে পারতাম না। আমি মিথ্যে কথা বলি না, আমার বাড়ির সব কথা আমাকে বলতেই হতো, না বললেও ওঁরা জানতেন ঠিকই—ওঁরা মনে করতেন আমি একটা নোংরা কুৎসিত বাড়ির মেয়ে।

—কিন্তু অনিতা, আমি তো তোমাকেই চেয়েছিলাম ! তোমার বাড়ির যা-ই ব্যাপার থাক না কেন ?

—তা হয় না। তুমি হয়তো আমার জন্য তোমার বাড়ি ছেড়ে আলাদা এরকম কোনো ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে, কিন্তু তোমাদের বাড়ির আনন্দময় পরিবেশ আমি ভেঙে দিতে চাইনি। সেটা হতো পাপ ! তোমাকে তোমার মা কিংবা ভাইবোনদের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে—

—ওঁরাও হয়তো মেনে নিতেন। অনিতা, আমি বুঝিয়ে বললে···

অনিতা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। মণিময়ের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, তোমাকে আমি কত ভালবাসতাম, তুমি জান না ? তুমি ছিলে আমার কাছে দেবতার মতন। তবু আমি বুঝেছিলাম, আমি তোমাকে পাব না। আমার বাবা-মায়ের অপরাধ তোমার বাবা-মা মেনে নিতে পারতেন না কিছুতেই। আমি জানি ! আমার জন্য

তুমি ওদের ছেড়ে এলে শান্তি পেতে না—আমি কত কেঁদেছি, একলা একলা, মণিদা, এখনও কাঁদি।

মনিময় স্তব্ধ হয়ে রইল। তার শরীরটা কাঁপছে। সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে অনিতা তার চেয়েও অনেক বড়। অনিতা যা বলছে, তা অস্বীকার করা যায় না। এক কুলটা নারীর মেয়েকে তার মা কি পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নিতে পারতেন? অথচ অনিতার তো কোনো দোষ নেই। অনিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে তার কাঁধে হাতটা রাখল। আবার তুলে নিল হাতটা। অনিতাকে সে কী সান্ত্বনা দেবে? অনিতার কান্না থামাবার মতন কোনো ভাষা সে জানে না! সে একজন বঞ্চিত মানুষের মতন চুপ করে বসে রইল।

তারা হেরে গেছে। সে আর অনিতা দুজনেই হেরে গেছে তাদের বাবা-মায়েদের কাছে।

সূর্যকান্তর প্রশ্ন

নার্সিং হোমের খাটে শুয়ে সূর্যকান্ত কী ভাবছেন এখন ?

সাদা ধপধপে চাদরের ওপর সূর্যকান্তর লম্বা শরীরটা যেন পুরো খাট জুড়ে আছে। চোখ বোজা। একটা হাত বুকের ওপর রাখা। একটু দূরে জানলার ধারে বসে আছে একজন নার্স। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল সূর্যকান্তকে, কিছুক্ষণ আগে তিনি খানিকটা ছটফট করেছেন। এখন তিনি ঘুমিয়ে না জেগে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মমতা কাল সারারাত সূর্যকান্তর শিয়রের কাছে জেগে বসেছিল। এখন তাকে জোর করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটু বিশ্রাম নেবার জন্য। আর কারুকে এখন এ ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। দরজার বাইরে থেকে অনেকেই উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। নার্সিং হোমের বাইরে বেশ ভিড়। দূর দূর থেকে অনেকে ছুটে আসছে সূর্যকান্তর খবর নেবার জন্য।

সূর্যকান্তর বয়েস বাহান্ন, বেশ নিটোল স্বাস্থ্য, লম্বা, মেদহীন শরীর। কিছুদিন আগে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অন্য কোনো নেশা নেই, এককালে খেলাধুলোর ঝোঁক ছিল। এখনও প্রতি শীতকালে ব্যাডমিণ্টন খেলেন। তবু এরকম একটি কাণ্ড ঘটে গেল !

খাদিমগঞ্জ থেকে একটা জিপে ফিরছিলেন সূর্যকান্ত। সারাদিন ধরে ধকল গেছে খুব। দুপুরে ভালো করে খাওয়াও হয়নি, সন্ধেবেলা হেড়োডাঙগায় পেঁৗছে সত্যনারায়ণ পুজোর সিন্নি খাওয়ার কথা। সূর্যকান্ত পরিশ্রম করতে পারেন প্রচণ্ড, তাঁর সঙ্গের লোকেরাও মেতে থাকে, খিদে-তেষ্টার কথা জানায় না।

পৌষ মাসের অপরাহ্ণ, আকাশের আলো মিলিয়ে যায় দ্রুত। রাস্তার দু'পাশে খোলা মাঠ ধু ধু করছে, পাতলা কুয়াশার মতন

নেমে আসছে অন্ধকার। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

সূর্যকান্ত বসেছিলেন জিপের পেছনে। সাধারণত তিনি সামনের সিটেই বসতে ভালোবাসেন, কখনো কখনো নিজেই জিপ চালান কিন্তু বাবলু আর জয়দীপ কিছুতেই তাঁকে সামনে বসতে দেবে না। দু'দিন আগেই একটা নির্জন রাস্তায় তাঁর জিপ আটকাবার চেষ্টা হয়েছিল, হঠাৎ দমাদ্দম করে এসে পড়েছিল পাথর। এর আগেও মানু দত্তর লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে দু'বার। সূর্যকান্ত ভয় পান না, কিন্তু বাবলু-জয়দীপরা ঝুঁকি নিতে চায় না। থানা থেকে একজন বডিগার্ড দেওয়া হয়েছে, বন্দুক নিয়ে সে বসে আছে ড্রাইভারের পাশে।

চলন্ত গাড়িতে বাবলু আর জয়দীপ নানান কথা বলে যাচ্ছে, সূর্যকান্ত চুপ করে শুনছিলেন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কিল মারছিলেন নিজের বুকে। কিসের যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। খানিকটা বাতাস যেন আটকা পড়ে গেছে বুকের মধ্যে, কিছুতে বেরুতে পারছে না। এরকম তাঁর কখনো হয়নি আগে।

কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দ্যাখ তো বাবলু, আমার জ্বর এসেছে নাকি?

বাবলু হাতটা ছুঁয়ে বললেন, কই না তো। গা তো গরম নয়।

তারপর সে সূর্যকান্তর কপালে হাত রেখে তাপ অনুভব করতে গিয়ে চমকে উঠে বললো, এ কী সূর্যদা, আপনি ঘামছেন?

সূর্যকান্ত বসলেল, ঘামছি, তাই না? মাঝে মাঝে শরীরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে, ঠিক জ্বরের মতন, তারপরেই আবার ঘাম হচ্ছে।

জয়দীপ বললো, আমার তো শীত শীত লাগছে। এর মধ্যে আপনার ঘাম হবে কেন?

বাবলু বললো, পরপর দু'রাত তো ঘুমই হয়নি। রাত দুটো-আড়াইটেয় শুয়েই আবার ভোর পাঁচটায় ওঠা। সূর্যদা, আজ রাত দশটায় শুয়ে পড়বেন। ঘুম চাই ভালো করে। না হলে খাটবেন কী করে?

সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ, আজ ঘুমোবো।

খানিক বাদে সূর্যকান্ত আবার বললেন, বড্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে

রে। গাড়িতে কি জলের বোতল-টোতল আছে ?

বাবলু আর জয়দীপ পরস্পরের দিকে তাকালো। গরমকাল নয়, তাই গাড়িতে জল রাখার কথা ওরা ভাবেনি।

জয়দীপ বললে, আর মাইল সাতেক দূরে কমলাপুর, সেখানে গিয়ে খাবেন।

সূর্যকান্ত বুক চেপে ধরে বললেন, তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে রে। অতক্ষণ থাকতে পারবো না। গাড়িটা এখানে থামাতে বল তো!

এই মাঠের মধ্যে কোথায় জল পাওয়া যাবে? নালা-ডোবা থাকলেও তো সেই জল পান করা যাবে না!

গাড়ি চালাচ্ছে পরিতোষ, সে বললো, সামনে একটা কুঁড়ে দেখা যাচ্ছে, আলো জ্বলছে, ওখানে থামবো।

সূর্যকান্ত বললেন, হ্যাঁ, থামা।

মাঠের মাঝখানে জিপ থামালে হঠাৎ মানু দত্তর লোকরা এসে হামলা করবে কি না, তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। কিন্তু সূর্যকান্ত প্রায় ছটফট করছেন তৃষ্ণায়।

জিপটা থামতে জয়দীপ বললো, আপনি বসুন সূর্যদা, আমি জল আনছি।

সূর্যকান্ত বললেন, তোকে যেতে হবে না। আমি খেয়ে আসছি। যার বাড়ি, তার সঙ্গে একটু কথাও বলে আসবো।

বাবলু বললো, আপনার শরীর ভালো লাগছে না, আপনি বসুন না, আমরা জল আনছি।

সূর্যকান্ত সে কথা শুনলেন না। লাফিয়ে নামলেন জিপ থেকে। একটুখানি টলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, এমন কিছু শরীর খারাপ নয় যে নিজে জল খেতে যেতে পারবো না।

কুঁড়েঘরটা রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে, একেবারে মাঠের মধ্যে। বাড়িটার সামনে একটা মস্ত তালগাছ। বন্দুকধারী গার্ডটি নেমে দাঁড়িয়েছে জিপ থেকে। সূর্যকান্ত একটু হেসে বললেন, তোমায় আসতে হবে না। বন্দুক নিয়ে কি কেউ লোকের বাড়িতে জল

চাইতে যায় ?

দু'পাশে বাবলু আর জয়দীপ, সূর্যকান্ত রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। তারপর এমনভাবে হঠাৎ ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে যে বাবলু-জয়দীপরা তাঁকে ধরারও সুযোগ পেল না।

মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকান্তর জ্ঞান চলে গেছে।

একটুক্ষণের জন্য দিশেহারা হয়ে গেল বাবলু-জয়দীপরা। ছোটাছুটি করে কুঁড়েঘরটা থেকে জল এনে সূর্যকান্তকে খাওয়াবার চেষ্টা করলো, মাথায় জল ছেটালো, কিন্তু কিছুতেই সূর্যকান্তর সাড় এলো না। সূর্যকান্তর মতন একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ কোন কারণে আচমকা এমন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, সে সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই।

অজ্ঞান সূর্যকান্তকে নিয়ে নার্সিং হোমে পৌঁছতে পৌঁছতে হয়ে গেল রাত দশটা। হাসপাতালের বদলে নার্সিং হোমে নিয়ে আসার কারণ ডাক্তার সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তর বন্ধু মানুষ। এটাই এ শহরের একমাত্র নার্সিং হোম। সন্তোষ মজুমদার তখন নার্সিং হোম ছেড়ে এক জায়গায় তাস খেলতে গিয়েছিলেন, তাঁকে খুঁজে আনতে সময় লেগে গেল আরও আধঘণ্টা।

সূর্যকান্তকে একনজর দেখেই সন্তোষ মজুমদারের মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি নিজেই যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

সূর্যকান্তকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে এনে ওষুধ দিতে দিতে সন্তোষ মজুমদার সব ঘটনা শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জল খাবার জন্য সূর্য যে জিপ থেকে লাফিয়ে নামলো, তাতেই ওর···তোমরা ওকে জোর করে বসিয়ে রাখতে পারলে না ? অবশ্য তোমরাই বা বুঝবে কী করে ? তারপর খাদিমগঞ্জ থেকে কমলাপুর খুব খারাপ রাস্তা, জিপটা এসেছে লাফাতে লাফাতে···ইস, গাড়িটা থামিয়ে সূর্যকান্তকে যদি শুইয়ে রাখতে পারতে···ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক, এই সময় একটু নড়াচড়া করা মানেই মৃত্যুকে আরও কাছে ডেকে আনা···।

সন্তোষ মজুমদার সূর্যকান্তকে নিজের দায়িত্বে রাখতে সাহস

পাচ্ছেন না। এই মফস্বল শহরের নার্সিং হোমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিছুই নেই, সব রকম ওষুধও পাওয়া যায় না, সূর্যকান্তকে বাঁচাতে হলে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতালের ডাক্তার চন্দন রায় দেখতে এসে বললেন, এই অবস্থায় সূর্যকান্তকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়াও খুব বিপজ্জনক, পথেই চরম কিছু ঘটে যেতে পারে।

সূর্যকান্ত গুণ্ডা-বদমাইশদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন শুনলে কেউ অবাক হতো না। কিন্তু তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে শুনে সবাই অবাক। এমন নীরোগ, সুস্থ-সমর্থ মানুষটার হার্ট হঠাৎ বেঁকে বসলো কেন?

আর ঠিক এগারো দিন পরে ভোট। সূর্যকান্তর জেতার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এখন কি লোকে আর এরকম একটা মুমূর্ষু মানুষকে ভোট দেবে?

সূর্যকান্ত নিজে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননি। তিনি রাজনীতির লোকও নন। সূর্যকান্তর বাবা ছিলেন উকিল, তিনি শেষ বয়েসে এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সূর্যকান্ত সেই কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছাত্রদের শুধু পড়িয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, আরও বহুদিকে তাঁর উৎসাহ। ছাত্রদের সঙ্গে খেলাধুলো করা, পিকনিকে যাওয়া, গান গাওয়া এসব তো আছেই। তাছাড়া তিনি ছুটির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের ছোট ছোট দল করে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাতেন, যাতে গ্রামের নিরক্ষর মানুষরাও কিছুটা লেখাপড়ার স্বাদ পেতে পারে। গ্রামের মানুষদের কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধি বোঝানো, গাছপালা রক্ষা করা বিষয়ে সচেতন করে তোলা, এইসব কাজ নিয়েও তিনি ঘুরেছেন বহু গ্রামে। এ মহকুমার অনেকেই তাঁকে চেনে।

এই এলাকার আগে পরপর তিনবার এম পি হয়েছিলেন বিধুভূষণ রায়। পুরনো আমলের জেলখাটা, আদর্শবাদী মানুষ, সবাই তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই ডামাডোল চলছে। একবার বামপন্থীরা, একবার কংগ্রেসিরা জেতে। দু'পক্ষে মারামারি হয়। গত নির্বাচনে হঠাৎ জিতে গেল মানু দত্ত, নির্দল

প্রার্থী হিসেবে। মানু দত্ত যে গুণ্ডা ও স্মাগলারদের নেতা, তা সবাই জানে। সে তিন-চারখানা পেট্রল পাম্পের মালিক, আরও কত রকম ব্যবসা তার আছে তার ঠিক নেই। প্রচুর টাকা ছড়ায় বলে তার সাঙ্গোপাঙ্গ অনেক। সে যে জিতবে কেউ আশাই করেনি, তবু এদেশে এখন এরকম অনেক গুণ্ডার সর্দারও দিব্যি ভোটে জিতে যায়। জিতে যাবার পর মানু দত্ত অন্যান্য দলের সঙ্গে দরাদরি শুরু করে দিল। সে কখনো এ দলে কখনো ও দলে যায়। পুলিশও তাকে ভয় পায়।

এ বছরেও দাঁড়িয়েছে মানু দত্ত।

সূর্যকান্ত এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। একদিন তাঁর ছেলে নীলকান্ত বললো, বাবা, আমাদের এই মহকুমায় মানু দত্তর মতন একজন বদমাশ লোক নেতা সেজে যাচ্ছে, সে চতুর্দিকে অত্যাচার করে বেড়ায়, চোর-ডাকাতদের পোষে, তবু সে লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবে, এটা ভাবতে আমাদের লজ্জা করে।

সূর্যকান্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সত্যি তো লজ্জার কথা। দেশটা এরকমই হয়ে যাচ্ছে। জানিস, ঐ মানু দত্ত আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়তো। এক ক্লাসে। স্কুল ফাইনাল পাস করতে পারেনি, তার আগে থেকেই ও স্মাগলারদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে! এখন সে দিল্লিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে।

নীলকান্ত বললো, বাবা, আমার কলেজের বন্ধুরা বলছে, তোমাকে দাঁড়াতে। মানু দত্তকে যে-কোনো উপায়ে এবার হারানো দরকার।

সূর্যকান্ত সে প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু তার পরদিন থেকে দলে দলে ছেলে এসে তাঁকে ঐ একই অনুরোধ জানাতে লাগলো। সূর্যকান্ত যতই অস্বীকার করেন, ততই তারা চেপে ধরে। এলো ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা, তারা সূর্যকান্তকে সাহায্য করবে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের একটা বিরাট দল এলো ঐ একই প্রস্তাব নিয়ে।

একসময় সূর্যকান্ত নিমরাজি হলেও ঘোর আপত্তি তুললেন মমতা। রাজনীতি মানেই অনেক নোংরা ব্যাপার, অনেক মিথ্যে

কথা ও গালাগাল, অন্য পার্টির ওপর কুৎসিত দোষারোপ, টাকা-পয়সায় ছিনিমিনি খেলা। এই পরিবেশের মধ্যে তিনি তাঁর স্বামীকে যেতে দিতে চান না কিছুতেই।

তখন একদল ছাত্র অনশন করতে শুরু করলো এই বাড়ির সামনে। নীলকান্তও তাদের মধ্যে একজন।

দু'দিন সেই ছেলেরা একেবারে কিছুই না খেয়ে শুয়ে থাকার পর মমতা কেঁদে ফেললেন।

তখন সূর্যকান্ত রাজি হলেন এই শর্তে যে, তিনি কোনো দলের হয়ে দাঁড়াবেন না। কারুর কাছ থেকে টাকা নেবেন না। কেউ যদি গাড়ি দিয়ে সাহায্য করে কিংবা স্বেচ্ছাসেবকদের একবেলা খাওয়াতে চায় তাহলে ঠিক আছে। তাঁর নিজের বিশেষ টাকা নেই, অন্যের টাকা নিয়েও তিনি নির্বাচন লড়বেন না।

সূর্যকান্ত নির্দল হিসেবে দাঁড়াবার পর বামপন্থী এবং কংগ্রেসিরা আলাদা আলাদাভাবে এসে তাঁকে ধরেছিল, নিজেদের দলে আসবার জন্য। সূর্যকান্ত বলেছিলেন, আমি কোনো দলে যাবো না কেন জানেন? এক দলে গেলেই অন্য দলকে গালাগাল দিতে হয়। সত্য-মিথ্যে মিলিয়ে অনেক রকম অভিযোগ তুলতে হয়। কিন্তু আমার স্ত্রী মাথার দিব্যি দিয়েছেন, আমি কারুকে গালাগালও দিতে পারবো না, একটা মিথ্যে কথাও উচ্চারণ করতে পারবো না। আমি লড়বো শুধু সততার পক্ষে। গুণ্ডামি, অরাজকতা, মিথ্যে আর কুরুচির বিরুদ্ধে। মানুষের ভালোবাসাই আমার একমাত্র সম্বল।

ভোটের প্রচারে নেমে সূর্যকান্ত অভিভূত হয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষ আসলে দলাদলি, অশান্তি, ধর্মীয় বিরোধ এসব কিছুই চায় না। তিনি যেখানেই যান, হাজার হাজার লোক তাঁর কথা শুনতে আসে। মুসলমানরা তাঁকে নিজেদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। হরিজনরা চাঁদা তুলে তাঁর লোকজনদের খাওয়ায়। হিন্দুরা তাঁকে আশীর্বাদ করে। সূর্যকান্ত সব জায়গায় বলেন, আমি মন্দির কিংবা মসজিদ গড়ার পক্ষে নই, আমি চাই আরও ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল হোক, গ্রামের মেয়েদের উপার্জনের ব্যবস্থা

হোক। ধর্ম থাকুক যার যার বাড়িতে, আমি ধর্মের বিপক্ষে নই, কিন্তু ধর্মের নামে যারা ছুরি-বোমা চালায় তারা সবাই পাষণ্ড, অধার্মিক, আপনারাও এই কথাটা ঘোষণা করুন।

একদিন মানু দত্তর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল রাস্তায়। মানু বাঁকা হেসে বলেছিল, সূয্যি, তুইও শেষ পর্যন্ত লোভে পড়ে ভোটে দাঁড়ালি? তোর মতন ভালো মানুষদের জন্য এসব লাইন নয়। পারবি না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে!

সূর্যকান্তও হেসে বলেছিলেন, মানু, লোকের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তোদের লাঠি-বন্দুক চোখরাঙানি দেখেও সাধারণ মানুষ আর ভয় পাচ্ছে না। তুই এবার এসব ছেড়ে দে। নইলে দেখবি, একদিন হাজার হাজার নিরীহ মানুষ তোদের মতন লোকদের তাড়া করছে!

সূর্যকান্তর জনপ্রিয়তা যত বাড়তে লাগলো, ততই খেপে উঠলো মানু দত্ত। সে নিজের চ্যালাদের লেলিয়ে দিয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল সূর্যকান্তকে। কিন্তু একদল কলেজের ছেলে সবসময় পাহারা দেয় সূর্যকান্তকে। তিনি বডিগার্ড নিতে চাননি, তবু থানা থেকে একজনকে দেওয়া হয়েছে। সবাই বুঝে গিয়েছিল, সূর্যকান্ত নির্ঘাৎ জিতবেন। তার মধ্যে হঠাৎ বজ্রপাতের মতন এরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল।

ডাক্তারদের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, সূর্যকান্তর বাঁচার আশা খুব কম। কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টার আয়ু আছে তাঁর।

প্রথম দু'দিন সম্পূর্ণ ঘোরের মধ্যে কাটলেও আজ সূর্যকান্তর জ্ঞান ফিরেছে। তিনি চোখ বুজে আছেন, কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তাঁর মাথা পরিষ্কার।

একটা কথাই তাঁর মনে আসছে বারবার। কেন এরকম হলো? শরীরের ওপর তেমন অত্যাচার করেননি কখনো, হৃদযন্ত্রটা তবু কেন এমন দুর্বল হলো? মানুষের জন্মমৃত্যুর কথা কিছুই বলা যায় না, তা ঠিকই। তাহলেও, মানু দত্তর মতন লোকেরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে, আর তাঁকে মরতে হবে অসময়ে, এটা কী রকম বিচার? কে এই বিচার করে? ঈশ্বর? তবে কি ঈশ্বর গণতন্ত্রে

বিশ্বাসী নন? তিনি মানু দত্তদেরই জিতিয়ে দিতে চান?

একটু পরে তিনি চোখ মেলে নার্সকে বললেন, একবার ডাক্তারকে ডাকুন তো!

সূর্যকান্ত পরিষ্কার গলায় কথা বলছেন শুনে নার্স খুশি হয়ে দৌড়ে চলে গেল। অনেক রোগ-মৃত্যু দেখেছে এই নার্স, কিন্তু সে-ও সূর্যকান্তর জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল।

তক্ষুণি এসে উপস্থিত হলেন সন্তোষ মজুমদার। শুরু করে দিলেন নানারকম পরীক্ষা। সূর্যকান্ত আপত্তি জানাতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিতে পারলেন না। শরীর দুর্বল। তিনি ফিসফিস করে বললেন, সন্তোষ, আর একটু কাছে আয়। সন্তোষ মজুমদার বন্ধুর খুব কাছে মুখটা আনলেন।

সূর্যকান্ত জিজ্ঞেস করলেন, ঠিক করে বল তো, আমার কি বাঁচার আশা আছে?

সন্তোষ মজুমদার একটু ইতস্তত করে কিছু বলতে যেতেই সূর্যকান্ত আবার বললেন, সত্যি কথা বল্। আমাকে শুধু শুধু সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। আমি আর কখনো সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াতে পারবো?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, আমরা ডাক্তাররা আর কতটুকু জানি? অনেক কিছু অলৌকিকভাবে ঘটে যায়। তুই তো ভগবানে বিশ্বাস করিস না, আমি করি। ভগবানের দয়া হলে তুই নিশ্চয়ই আবার সেরে উঠবি।

সূর্যকান্ত বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভগবানের দয়া। ভগবান কি রাগ করে আমায় এমন রোগ দিলেন? আমি কী অন্যায় করেছি?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, ওসব কথা এখন ভাবিস না। কথা বলতে হবে না, চুপ করে থাক। সব ঠিক হয়ে যাবে।

সূর্যকান্তর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। শারীরিক কষ্টের চেয়েও তাঁর মানসিক কষ্ট হচ্ছে অনেক বেশি। তিনি কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। মানু দত্তর মতন লোকরা এত অন্যায় অত্যাচার করেও কী করে ভোটে জেতে? কত লোক ধর্মের নামে ছুরি শানায়, অন্য ধর্মের মানুষের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়, ধর্মের নামে নৃশংস

খুনোখুনি হয়, তবু লোকে ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের ওপর ভরসা রাখে কী করে?

সূর্যকান্তর অসুস্থতার খবর রটে গেছে চতুর্দিকে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা এখন প্রচার করছে যে সূর্যকান্ত বেঁচে উঠলেও কোনোদিন আর পূর্ণ কর্মক্ষম হবেন না। সুতরাং এই লোককে জয়ী করে কী হবে?

সূর্যকান্তর সমর্থকরা মুষড়ে পড়েছে খুব। কেউ কেউ যখন তখন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। সূর্যকান্ত যুবসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, এই অঞ্চলে একটা সুস্থ, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, এখন তারা একেবারে দিশেহারা।

সেদিত বিকেলবেলা হঠাৎ মানু দত্ত সদলবলে এলো নার্সিং হোমে। সূর্যকান্তর সঙ্গে বাইরের কারুকেই দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু মানু দত্ত ওসব বাধা মানবার পাত্র নয়। তার দলের লোকেরা চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিল।

মানু দত্ত তাদের থামতে বলে সন্তোষ মজুমদারের সামনে হাত-জোড় করে বেশ আবেগের সঙ্গে বললো, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি সূর্যকান্তর অপোনেন্ট হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি আমার পুরনো ইস্কুলের বন্ধুকে দেখতে। সে এত অসুস্থ, তাকে একবার দেখে যাবো না? আমি কি এতই অমানুষ?

সন্তোষ মজুমদার বুঝলেন, আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। তাহলে তাঁর নার্সিং হোম এরা ভেঙে দিয়ে যাবে। সূর্যকান্তর সঙ্গে দেখা করতে আসাটা নিশ্চয়ই মানু দত্তর একটা রাজনৈতিক চাল। সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিয়ে এসেছে।

সূর্যকান্তর নাকে তখন অক্সিজেনের নল। নিঃশ্বাস খুব ক্ষীণ। কিন্তু এখনো মাথা পরিষ্কার। মানু দত্তকে চিনতে তাঁর অসুবিধে হলো না। মানু দত্ত কী বলছে তা তিনি শুনতেও পাচ্ছেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারছেন না।

খানিকক্ষণ মামুলি সান্ত্বনার কথা বলার পর মানু দত্ত খুব কাছে এসে বললো, সূর্য, তুই আমার পুরনো বন্ধু, তোকে আমি বাঁচাবোই। মতভেদ যতই থাকুক, তবু বন্ধুকে বন্ধু দেখবে না?

তার জন্য কলকাতা থেকে আমি বড় ডাক্তার আনাবো। যত টাকা লাগে লাগুক। আমার গাড়িতে ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি এক্ষুণি। তাকে বাঁচতেই হবে।

হঠাৎ সূর্যকান্ত বুঝতে পারলেন মানু দত্তর আসল উদ্দেশ্যটা। সে চ্যালাদের দিয়ে বোমা ছুঁড়িয়ে সূর্যকান্তকে জখম করতে চেয়েছিল আগে, এখন সে সূর্যকান্তকে বাঁচাবার জন্য এত ব্যস্ত কেন? কারণ একটাই। সূর্যকান্ত এখন হঠাৎ মরে গেলে এই কেন্দ্রে নির্বাচনই বন্ধ হয়ে যাবে। আবার কবে হবে তার ঠিক নেই। মানু দত্ত এবার যে এত টাকা-পয়সা খরচ করলো, তা বরবাদ হয়ে যাবে। আবার নতুন করে সবকিছু করতে হবে পরের বার। সূর্যকান্ত আর দশটা দিন অন্তত বেঁচে থাকলেও মানু দত্ত জিতে যেতে পারে।

সূর্যকান্তর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো, তিনি দু'দিকে মাথা নেড়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, না!

অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, মানু দত্তকে তিনি এবার জিততে দেবেন না।

ভগবান তাঁর ওপর রাগ করেছেন কিংবা পরে আবার দয়া করবেন কি না, তা নিয়ে আর সূর্যকান্ত মাথা ঘামাতে চান না। অক্ষম, দুর্বল হয়ে, সব রকম অবিচার মেনে নিয়ে তিনি বাঁচতেও চান না। এখনো মানু দত্তর মতন মানুষকে হারাবার ক্ষমতা তাঁর আছে।

সূর্যকান্ত দুর্বল হাতটা তুলে নাক থেকে খুলে নিলেন অক্সিজেনের নল!

সূর্যকান্তর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, মাথার মধ্যে শুনতে পাচ্ছেন মৃত্যুর পদশব্দ। তবু তিনি ভাবতে লাগলেন, নির্বাচন স্থগিত হয়ে যাবে এখানে। আবার কয়েক মাস পরে যখন নির্বাচন হবে তার মধ্যে অন্য কেউ, আর একজন সাহসী, সত্যবাদী কেউ কি মানু দত্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না?

সূর্যকান্তর বুকে শেষ ধ্বনিটা এই রকম, পারবে, পারবে, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে!

ভুল মানুষের গল্প

হোটেলটা নতুন। এদিক দিয়ে যাওয়া-আসার পথে বাইরে থেকে কয়েকবার দেখেছে মনোজ, এর আগে ভেতরে কখনো ঢোকেনি। প্রয়োজন হয়নি।

ট্যাক্সি থেকে নামবার পর মনোজ কার্ডটা আর একবার দেখে নিল। পার্টিটা হচ্ছে পার্ল রুমে। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে মনোজ দাঁড়িয়ে রইলো একটুক্ষণ। মস্তবড় একটা হল, তার এদিক-সেদিকে সোফায় বসে আছে নানা ধরনের মানুষ, কিছু সাহেব-মেমও রয়েছে। হোটেলটা নতুন, তাই চতুর্দিক একেবারে ঝকঝকে তকতকে।

পার্ল রুমটা কোন্ দিকে? কোথাও তা লেখা নেই। রিসেপশান কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করতেই সেখানকার মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, আপনি ডানদিক দিয়ে সোজা চলে যান, স্যার, একেবারে সামনেই দেখতে পাবেন।

অফিস সংক্রান্ত ব্যাপারেই মনোজকে মাঝে মাঝে এ-রকম পার্টিতে আসতে হয়। ককটেল অ্যান্ড ডিনার। একই ধরনের কথাবার্তা, দেঁতো হাসি. মদ্যপান করতে হয় সাবধানে, যাতে নেশা না হয়। খাবারগুলো পাঁচমিশেলি, খানিকটা পাঞ্জাবি. খানিকটা মোগলাই আর খানিকটা ওয়েস্টার্ন, এরকম খাবার মনোজ খুব উপভোগ করে না।

পুনার একটা ফার্মের সঙ্গে কোলাবরেশানে বেশ বড় ধরনের নতুন একটা প্রজেক্ট পেয়েছে মনোজের অফিসে, কথাবার্তা প্রায় পাকা, সেইজন্যই আজ সন্ধের পার্টি। সাড়ে সাতটায় আরম্ভ, মনোজ প্রায় একঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে, তার ইচ্ছে আগে কেটে পড়া।

লম্বা করাইডোর দিয়ে অনেকখানি হেঁটে আসার পর মনোজ

দেখতে পেল, সামনেই লেখা রয়েছে পার্ল রুম। দেরি হয়ে গেছে বলে নিশ্চয়ই তাদের এম. ডি. তালুকদার সাহেব একটু ভুরু কুঁচকোবেন। উনি অনেক ব্যাপারে পাক্কা সাহেব, যে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টে এক মিনিটও সময়ের এদিক ওদিক করেন না।

মনোজ তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভিড়ের মধ্যে পেছনের দিকে যদি চলে যাওয়া যায়, তা হলে তালুকদার সাহেবকে বোঝানো যেতে পারে যে সে কিছুটা আগেই এসেছে।

ঘরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন নারী-পুরুষ। এইসব পার্টিতে এলেই একটা ভোমরার চাকের মতন গুঞ্জন শোনা যায়, এখানে কেউ জোরে কথা বলে না, জোরে হাসে না।

মনোজ অনেকটা পেছন দিকে চলে এসে অন্যদের থেকে একটু দূরত্ব রেখে দাঁড়ালো। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে দেখার চেষ্টা করলো তালুকদার সাহেব কোন্ দিকে।

তালুকদার সাহেবকে কোথাও দেখা গেল না।

তালুকদার প্রায় ছ'ফুট লম্বা। চওড়াও কম নয়, সবসময় স্যুট পরে থাকেন, যে কোন ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখা যাবেই। তা হলে কি তালুকদার আসেননি? এরকম কক্ষণো হয় না। আজ দুপুরেও তাঁর সঙ্গে মনোজের কথা হয়েছে। তা হলে নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে। একটি বেয়ারা এসে তার সামনে ট্রে নিয়ে দাঁড়াতেই মনোজ একটা হুইস্কির গেলাস তুলে নিল।

তা হলে শৈলেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে তালুকদারের কথা। পাণ্ডে কোথায়? চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে পাণ্ডেকেও খুঁজে পেল না মনোজ।

তালুকদার আসেনি, পাণ্ডে আসেনি, কী ব্যাপার? সুহাস বলেছিল, সে মনোজের সঙ্গেই ফিরবে। সুহাস কোথায়?

হঠাৎ মনোজের শরীরে যেন একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। তাদের অফিস থেকে আটজনের আসার কথা, তার মধ্যে সাতজনই সস্ত্রীক। সেই সাত জোড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনকেও দেখতে পাচ্ছে না মনোজ। কেউ আসেনি! পার্টি শুরু হয়ে গেছে এক-ঘণ্টা, অথচ এর মধ্যে তাদের অফিসের একজনও আসেনি, এ হতেই

পারে না।

তা হলে মনোজ নিশ্চয়ই ভুল জায়গায় এসেছে। দেয়ালের দিকে ফিরে মনোজ গোপনে পকেট থেকে কার্ডটা বার করে দেখলো। দেখলো। না, পার্ল রুম স্পষ্ট লেখা আছে। তারিখ ভুল করারও প্রশ্ন ওঠে না। অফিসে আজই কয়েকজনের সঙ্গে কথা হয়েছে এই পার্টি বিষয়ে। পুনার ফার্মটির কয়েকজনের সঙ্গে তিন-চার দিন ধরে অনেকবার দেখা হয়েছে. ভালোই মুখ চেনা হয়ে গেছে, তাদেরও কেউ নেই। কয়েকজন সরকারি অফিসারের থাকার কথা, তাদেরও দেখা যাচ্ছে না।

তা হলে কি শেষ মুহূর্তে ক্যানসেল্ড হয়ে গেছে কোনো কারণে? অফিস থেকে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে উত্তরপাড়ায় অসুস্থ বড়মামাকে দেখতে যেতে হয়েছিল মনোজকে। সেখান থেকে সে সোজা এসেছে এর মধ্যে অন্য কিছু ঘটে গেল?

সে যাই হোক, মনোজ যে ভুল পার্টিতে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না, কেউ তার সঙ্গে কথা বলছে না। তবু মনোজের সারা শরীরময় অস্বস্তি। কেউ কি ভাবছে সে একটা বাজে লোক, বিনা আমন্ত্রণে এখানে ঢুকে পড়েছে বিনা পয়সায় মদ আর খাবার খাবে বলে? সে কারুর সঙ্গে গল্প করছে না দেখে বেয়ারারাও কি সন্দেহ করছে কিছু?

মনোজ একটা ভালো কোম্পানির চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু এখানে কেউ যদি তাকে চেনে না। কেউ যদি তাকে এসে এখন চ্যালেঞ্জ করে, সে কিছু প্রমাণও করতে পারবে না। এক্ষুণি এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত? একটা লোক ঢুকলো, এক গেলাস মদ খেলো, তারপর কারুর সঙ্গে কিছু কথা না বলে বেরিয়ে গেল, এটাই বা কেমন দেখায়? এখন দরজার সামনেই তিন-চারজন দাঁড়িয়ে আছে তারা যদি কিছু জিজ্ঞেস করে?

এক জায়গায় তিন-চারজন মহিলা বসে আছে, তাদের একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতে মহিলাটি চোখ ফিরিয়ে নিল না। বরং তার দৃষ্টিতে যেন ফুটে উঠলো কৌতূহল।

মনোজ আর একবার তাকাতেই মহিলাটি হাসলো। তারপর সোজা এগিয়ে এলো মনোজের দিকে। মনোজের কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। অথচ একজন সুন্দরী মহিলাকে দেখে তার কি ভয় পাওয়ার কথা?

মহিলাটি কাছে এসে সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, কী খবর? অনেকদিন দেখিনি, কলকাতায় ছিলে না বুঝি?

মহিলাটিকে একেবারেই চিনতে পারলো না মনোজ। কিন্তু কোনো মহিলার মুখের ওপর সে কথা বলা যায় না। এমনও হতে পারে, অনেকদিন আগে কোথাও আলাপ হয়েছিল।

এইসব ক্ষেত্রে দু'তিন মিনিট তা-না-না-না করে আলাপ চালিয়ে গেলে হঠাৎ কোনো পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়ে। তবু তো একজন কথা বলল মনোজের সঙ্গে।

মহিলাটির বয়েস তিরিশের এপাশে-ওপাশে। সাজ-পোশাকের বেশ বাড়াবাড়ি আছে, গলায় লম্বা একটা সোনার হার, আজকাল সাধারণত কেউ এরকম হার পরতে সাহস পায় না। মুখখানা সুন্দর, কিন্তু চোখ দুটি বড় বেশি তীক্ষ্ন।

মনোজ হাত জোড় করে বলল, নমস্কার, ভালো আছেন!

মহিলাটি মনোজের গলা নকল করে বলল, হ্যাঁ গো, মশাই, ভালো আছি। প্রায় দু'বছর আমাদের কোনো খোঁজই নাওনি!

মহিলাটি তাকে তুমি তুমি বলছে। তার মানে অনেকখানি ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক। মনোজের কি এতটা ভুল হতে পারে? এই মহিলাকে সে জীবনে কখনো দেখেছে বলেই মনে পড়ছে না।

মহিলাটি এবার নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমার ওপরে এখনো রাগ আছে বুঝি?

এ প্রশ্নের উত্তরে মনোজ কিছু বলার সুযোগ পেল না। মহিলাটি মুখ তুলে একটু দূরের একজনকে ডেকে বলল, এই দ্যাখো, এতকাল পরে বিজন কোথা থেকে এসে হাজির হয়েছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের সঙ্গে কোনো কথাও বলেনি।

রোগা-পাতলা, ভালো মানুষ চেহারার একজন লোক অন্য এক-জনের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, এদিকে তাকিয়ে যেন ভূত দেখার মতন

কয়েক মুহূর্ত থমকে রইলো। তারপর এগিয়ে এসে মনোজের পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, কী রে, বিজন, তুই এতদিন কোথায় ছিলি! এর মধ্যে গোঁফটা কামিয়ে ফেলেছিস দেখছি!

এবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ওরা মনোজকে অন্য লোক বলে ভুল করেছে।

মনোজ শুধু ভুল পার্টিতে আসেনি, সে এখন অন্য মানুষ!

এখুনি ওদের ভুল না ভাঙিয়ে দিলেও চলে। দেখাই যাক না।

সেই লোকটি বলল, তুই বছর দু' এক আগে হায়দ্রাবাদ থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিলি, তারপর আর কোনো খবর দিসনি!

মনোজ জীবনে কখনো হায়দ্রাবাদে যায়নি। সে তাকিয়ে রইলো হাসি হাসি মুখে।

মহিলাটি জিজ্ঞেস করলো, তোমার মা এখন কেমন আছেন?

মনোজ বলল, ভালো। এখন ভালো আছেন।

এটা মিথ্যে কথা নয়।

লোকটি বলল, এ কী গেলাস খালি কেন? এই বেয়ারা, এদিকে হুইস্কি দাও।

মহিলাটি বলল, এই, তুমি ওকে বেশি বেশি মদ খাওয়াবে না! তুমি নিজে যত ইচ্ছে খাবে বলে অন্যদেরও জোর করে খাওয়াবে।

পুরুষটি হেসে বলল, সুনন্দা, তোমার দেখছি, স্বামীর চেয়েও বিজনের ওপর বেশি দরদ। অথচ এতদিন তো তোমার খোঁজও নেয়নি।

মহিলাটির নাম জানা গেল। সুনন্দা। পুরুষটির নাম কী?

মনোজ বলল, আমাকে ঘন ঘন দিল্লি যেতে হয়েছে, খুব কাজের চাপ ছিল।

সুনন্দা পাতলা অভিমানী গলায় বলল, আহা, তা বলে বুঝি একটা চিঠিও লেখা যায় না?

লোকটি বলল, সেই যে তোমাদের মধ্যে একদিন খুব কথা কাটাকাটি হলো, মান-অভিমান, তারপর থেকেই তো বিজন হাওয়া।

সুনন্দা বলল, সেটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। তার মধ্যে তুমি নাক গলাতে এসো না।

লোকটি বলল, আমি নাক গলাতে চাইও না।

নিজের হুইস্কির গেলাসটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করে সে হঠাৎ আরও কাছেএসে ফিসফিস করে বলল এই পার্টি'টা একেবারে ডাল! সবাই গম্ভীর গম্ভীর হয়ে আছে! চল, এখান থেকে কেটে পড়ি। অরুণের কাছে যাই।

মনোজ বলল, অরুণ?

লোকটি বলল, অরুণের বাড়িতে একটা ঘরোয়া পার্টি আছে। অনেক করে যেতে বলেছিল। তোকে দেখলে খুব খুশি হবে!

সুনন্দা বলল, তাই ভালো। চলো, চলে যাই। কিন্তু অরুণের ওখানেই বা যাবার দরকার কী? আমাদের বাড়িতেই তো বসতে পারি। আমার তো ড্রিংকস রয়েছে।

লোকটি বলল, একবার অরুণের বাড়িটা ছুঁয়ে যেতে হবে।

সুনন্দা মনোজের বাহু ছুঁয়ে বলল, চলো, বিজন, চলো। তোমার জন্য আমার অনেক কথা জমে আছে।

মনোজ ভাবলো, এই লোকটি সুনন্দার স্বামী। দুজনকে ঠিক যেন মানায় না। বিজন নামে এদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। তার সঙ্গে সুনন্দার খুব ভাব, মান-অভিমানের সম্পর্ক। কিন্তু সেটা সে স্বামীকে গোপন করে না, তার স্বামী সব জানে, মেনে নিয়েছে। একদিন কোনো কারণে বিজন এই সুনন্দার ওপর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

এর আড়ালে যেন একটা গল্প আছে। সেই গল্পটা পুরো জানবার জন্য মনোজের দারুণ কৌতূহল হলো। কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন করে রাখা কি অন্যায়? ওদের ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য মনোজ তো নিজে থেকে বিজন সাজেনি। ওদের ভুলটা আর একটু পরে ভাঙলেই বা ক্ষতি কী?

সে বলল, ঠিক আছে, চলো!

দরজার সামনে একজন লোক সুনন্দার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, একী, প্রীতমদা, এর মধ্যেই চললেন নাকি? খাবেন না?

প্রীতম বলল, না, ভাই, আর একটা জায়গায় যেতেই হবে!

সুনন্দা মনোজের হাত ধরে ততক্ষণে বাইরে নিয়ে এসেছে।

এবারে মনোজ দেখলো, পাশেই আর একটা হল রয়েছে, সেখানেও পার্টি চলছে একটা, তারও বাইরে লেখা পার্ল রুম। পার্ল রুম দুটো আছে, ওয়ান আর টু। মনোজ অত লক্ষ্য করেনি, সে দু'নম্বর পার্ল রুমের পার্টিতে যোগ দিয়েছিল।

তার মানে এক নম্বর পার্ল রুমে তার অফিসের পার্টি চলছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে এখন আর কী হবে। এখন মনোজ অন্য একটা গল্পে ঢুকে পড়েছে। সে দ্রুত সরে এলো সেখান থেকে।

বাইরে এসে প্রীতম গাড়ির নাম্বার বলে দিল। তারপর মনোজকে জিজ্ঞেস করলো তুই কি এখনো দিল্লিতে থাকছিস ?

মনোজ বলল, না, কলকাতায়।

সুনন্দা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ফ্ল্যাট নিয়েছো, বিজন ? কোন্ পাড়ায় ?

মনোজ বলল, যোধপুর পার্ক!

সুনন্দা বলল, তাহলে তো আমাদের বাড়ির কাছেই।

প্রীতম বলল, শালা, তুই চুপি চুপি কলকাতায় ফ্ল্যাট নিয়ে সেট্‌ল করেছিস, তবু আমাদের কোনো খবর দিসনি ? সুনন্দা বুঝি তোকে খুবই কঠিন কিছু বলেছিল ?

সুনন্দা বলল, আমি মোটেই সেরকম কিছু বলিনি সেদিন। বিজন আসলে ভুল বুঝেছিল। তুমি আর আমাদের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না তো।

মনোজ সুনন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এ কী রকম সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর ? বিজন কি প্রীতমের স্ত্রীর প্রেমিক ? প্রীতম সেটা মেনে নিয়েছে ?

গাড়িটা এসে পোর্টিকোতে দাঁড়ালো।

গাড়িতে উঠতে একটু দ্বিধা করলো মনোজ। বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো ? সে আর কতক্ষণ বিজন সেজে থাকবে ? বিজন সত্যিই রাগ করে কিংবা অভিমানে দূরে সরে আছে, সে হয়তো কোনোদিনই এদের মাঝখানে আর আসতে চায় না।

ওঠ্, ওঠ্ বলে প্রায় ঠেলেই মনোজকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল প্রীতম। সুনন্দাকে মাঝখানে বসিয়ে সে বসলো অন্য পাশে।

তারপর প্রীতম বলল, তাহলে অরুণের ওখানে আগে একটু ঘুরে আসবো তো?

সুনন্দা বলল, না আজ থাক। বাড়িতেই চলো। বাড়িতেই আড্ডা দেবো। রাত বেশি হয়নি!

প্রীতম বলল, ঠিক আছে। আজ বিজনের অনারে ভালো স্কচের বোতলটা খোলা হবে। কোনো দোকান থেকে কাবাব কিনে নিয়ে গেলে হয় না?

সুনন্দা বলল, দোকানের খাবার দরকার নেই। বাড়িতে মাছ আছে, ভেজে দিতে বলবো। বিজন মাছ ভাজা ভালোবাসে।

প্রীতম বলল, তোর কী হয়েছে রে, বিজন? এত চুপচাপ কেন?

মনোজ শুকনোভাবে হেসে বলল, না, শুনছি!

খানিক দূর যাবার পর প্রীতম বলল, সুনন্দা, অরুণের বাড়িটা একবার অন্তত না গেলে খারাপ দেখাবে। অনেক করে বলেছিল। চলো না, মাত্র আধঘণ্টা থাকবো!

সুনন্দা বলল, আজ ইচ্ছে করছে না। তাছাড়া অরুণদা বিজনকে ভালো করে চেনে না।

প্রীতম বলল, তাহলে এক কাজ করা যাক। তুমি আর বিজন বাড়িতে নেমে যাও! আমি একবার অরুণের ওখানটা ঘুরে আসি।

সুনন্দা ভুরু কুঁচকে বলল, তোমাকে অরুণের বাড়িতে যেতেই হবে? কেন?

প্রীতম বলল, কথা দিয়েছিলাম, একবার ঘুরে আসি!

সুনন্দা বলল, আট-দশজনের পার্টি। একজন না গেলে কিছু হয় না। অরুণও কয়েকবার কথা দিয়ে তারপর আসেনি!

প্রীতম বলল, তুমি যেতে না চাও যেও না, কিন্তু আমি গেলে তোমার আপত্তি কিসের?

সুনন্দা বলল, তুমি একবার ওখানে জমে গেলে কতক্ষণে ফিরবে তার কোনো ঠিক নেই। আমরা শুধু শুধু বসে থাকবো?

প্রীতম এবার ভুরু তুলে কৌতুকের সুরে বলল, শুধু শুধু বসে থাকবে কেন? গল্প করবে! তুমিই তো বললে, বিজনের জন্য তোমার অনেক গল্প জমে আছে। আমি সেখানে থেকে কী করবো?

সুনন্দা হঠাৎ তীব্র ভাবে বলল, তার মানে?

প্রীতম হাসতে হাসতেই বলল, তার মানে, তোমাদের মান-অভিমান ভাঙাবার ব্যাপার চলবে। তার মধ্যে থেকে আমি কী করবো?

সুনন্দা বলল, তুমি কী ভাবছো বলতো?

প্রীতম বলল, আমি কিছুই ভাবছি না। তোমরা গল্প করো না নিরিবিলিতে!

সুনন্দা বলল, বিজনের সঙ্গে তুমি বুঝি গল্প করতে চাও না?

প্রীতম বলল, আমি ফিরে আসি। তখন গল্প হবে। বিজনকে আজ রাতটা রেখে দাও আমাদের ওখানে!

সুনন্দা বলল, তোমার আজ অরুণের বাড়িতে যাওয়া চলবে না।

প্রীতম বলল, তুমি এত আপত্তি করছো কেন? আমি তোমাদের দুজনকে খানিকটা সুযোগ দিচ্ছি—

সুনন্দা চিৎকার করে বলল, সুযোগ দিচ্ছো? ছি ছি ছি ছি, তুমি এমন একটা কথা বলতে পারলে আমাকে?

প্রীতম বলল, অত উত্তেজিত হয়ো না!

সুনন্দা বলল, গাড়ি থামাও! আমি এক্ষুণি নেমে যাবো!

প্রীতম বলল, এই, এই, কী হচ্ছে কী? বিজন, তুই একটু বুঝিয়ে বলতো?

মনোজ গম্ভীরভাবে বলল, আমি বিজন নই!

সুনন্দা গাড়ির দরজা খুলতে যাচ্ছিল, চমকে ফিরে তাকালো।

মনোজ বলল, আমি বিজন নই। কোনো কালে আমার গোঁফ ছিল না। আমার নাম মনোজ বর্মণ, আমি স্মিথ্ মার্টিন কোম্পানিতে কাজ করি। আপনারা আমাকে বিজন বলে ভুল করেছিলেন, তাই আমি একটু মজা করছিলাম!

প্রীতম মনোজের চিবুকটা ধরে ঘুরিয়ে দিল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, প্রায় হুবহু মিল, শুধু ডানদিকের জুলপির পাশে কাটা দাগটা নেই।

সুনন্দা ফ্যাকাসে গলায় বলল, তুমি···আপনি সত্যি বিজন নন!

মনোজ বলল, মাপ করবেন ! প্রথমেই হয়তো আমার বলা উচিত ছিল।

প্রীতম বলল, সত্যিই তো ! যাকগে, তাতে কী হয়েছে, আপনি বিজন না হোক মনোজই হলেন। চলুন, আপনার সঙ্গেই আলাপ করা যাক। আমাদের বাড়িতে চলুন। আমি তাহলে অরুণের ওখানে যাবো না !

মনোজ বলল, আজ থাক। আজ আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। আমাকে ঐ সামনের মোড়ে নামিয়ে দিন। ওখানে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

সুনন্দা একেবারে চুপ করে গেছে। প্রীতম আরও কয়েকবার অনুরোধ করলেও মনোজ প্রায় জোর করেই নেমে গেল গাড়ি থেকে।

রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরালো মনোজ। তার মনে হলো, ভুল করে অন্য পার্টিতে ঢুকে পড়া যায়, কিন্তু জোর করে অন্যের জীবনের গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়া বিপজ্জনক। সেই জন্যই বোধহয় তার বুক কাঁপছে।

সুধাময়ের বাবা

ধানের বদলে এবার রজনীগন্ধার চাষ দিয়েছে জয়কেষ্ট। নতুন রকমের চাষ, তাই তার শরীরে এসেছে নতুন শক্তির জোয়ার।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল কাশেম আলি। ফুলের চাষের কথা জয়কেষ্ট সাতজন্মে শোনেনি। ফুল ফোটে বসত বাড়ির ধারে পাশে, চাষের জমিতে ফলে ধান, পাট, গম রবিশস্য। কিন্তু কাশেম আলি বললেন, ফুলেরও ভাল বাজার আছে, দরও বেশ চড়া, ঝপ করে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

ফুলের বাগান নয়, ফুল-চাষের খেতে ঘুরছে জয়কেষ্ট, এর মধ্যেই কুঁড়ি আসতে শুরু করেছে, ফসল তোলার আর দেরি নেই। এই মাল বেচবার জন্য হাটে যেতে হয় না, কলকাতার হাওড়া ব্রিজের নিচে বিরাট ফুলের বাজার, সেখানকার পাইকাররা এসে মাল তুলে নিয়ে যায়।

একটা ঝাড়ে কুঁড়ি ফুটে গেছে, সবুজের মধ্যে ফুটফুট করছে সাদা সাদা ফুলের মুখ। জয়কেষ্ট আপন মনে বলল, আহা রে। ধান কাটার সময় মায়া লাগে না। অনেকখানি ডাঁটা শুদ্ধু এই গাছ কেটে ফেলতে হবে।

হঠাৎ জয়কেষ্টর মনে হল, তার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। একী, ভূমিকম্প শুরু হল নাকি? জয়কেষ্টর পা কাঁপছে, বুক কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। না, এ তো তার শরীরের অসুখ নয়, ফুল-গাছগুলোও দুলছে খুব জোরে জোর, অথচ বাতাস নেই, তা হলে দুলছেন বসুমতী।

কিন্তু একটু দূরের তালগাছ জোড়া স্থির, তার জমির দু'পাশের ধানের খেতে ঢেউ নেই, আর কোথাও কোনও চাঞ্চল্য নেই। তাহলে কি ফুলের খেতই শুধু কাঁপে? হবেও বা। মাটি থেকে ধানের চারায় যে রস ওঠে, আর ফুলের চারায় সে রস ওঠে, তা নিশ্চয়ই

আলাদা।

জয়কেষ্ট গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ফিরতে লাগল। এসেছে সেই কাকভোরে। এখন সূর্য মাথার ওপরে। এখন আর জমিতে অত তদারকি লাগে না, কীটনাশক স্প্রে করে দিয়েছে, দুদিন বৃষ্টির জন্য ভিজে আছে জমি। তবু জয়কেষ্ট এখানে এসে বসে থাকে। বসে থাকতে তার ভাল লাগে। নতুন রকম চাষ তো!

বাড়ি বেশ খানিকটা দূরে। হাঁটতে হাঁটতে জয়কেষ্ট দু'পাশের জমির দিকে তাকায়। আগে এইসব জমির অনেকখানিই ছিল তাদের বংশের। দুই কাকা মামলা করে অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। জয়কেষ্টর তিন মেয়ের বিয়ের জন্য মোট চোদ্দ বিঘে জমি বেচতে হয়েছে। এখন আছে মাত্র পাঁচ বিঘে। তাতে সম্বৎসরের খোরাকি জোটানো কষ্টকর, একটা বড় পুকুরের ছ'আনি মালিকানা আছে বলে কিছু টাকা পায়। চলে যায় কোনওক্রমে। আগে জয়কেষ্ট নিজের হাতে চাষও করত না। তারা আসলে তাঁতি, তারা কখনও হাল ধরেনি। কিন্তু এখন মিলের যুগ, কো-অপারেটিভের যুগ, একলা তাঁত বুনে কোনও সুসার নেই, পড়তা পোষায় না। তাঁতগুলো পড়ে পড়ে পচছিল, কিছুদিন আগে উনুনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে। জমিও অন্যদের হাতে ফেলে রাখা যায় না। বর্গাদার নাম লিখিয়ে নেবে।

জয়কেষ্ট নিজেই মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে বলে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে জয়কেষ্ট একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেল। তার বাড়িতেই কেউ কাঁদছে।

উঠোনে জয়কেষ্টর স্ত্রী দামিনীকে ঘিরে রয়েছে গুটি পাঁচেক রমণী। দামিনী মাথা চাপড়ে চাপড়ে ডাক ছেড়ে কান্নাকাটি করছে। প্রতিবেশী পুরুষরা দাঁড়িয়ে আছে অনেক দূরে, তারা বাড়ির মধ্যে আসবে না।

এই কিছুক্ষণ আগে, দশ-বারোজন লোক লাঠি-সোঁটা-বর্শা নিয়ে এসেছিল। তারা লুটপাট করেনি, শুধু সুধাময়কে জোর করে টেনে-হিঁচড়ে ধরে নিয়ে গেছে। সুধাময় তখন পড়তে

বসেছিল। এই দম্পতির প্রথমেই একটি ছেলে জন্মেছিল, সে বেঁচে নেই, তিন মেয়ের পর ছোট ছেলে সুধাময়, সে কলেজে দুটো পাস দিয়েছে, আর একটা পাস বাকি। এ বংশের কেউ আগে স্কুলের পাঁচ ক্লাসের বেশি পেরোয়নি। সুধাময় একেবারে কলেজে। তাও তার মাইনে লাগে না জলপানি পায়। পড়ার দিকে তার এত ঝোঁক যে, বই নিয়ে বসলে নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাঁতির ছেলের পেটে অত বিদ্যে সহ্য হবে কেন, উগ্রপন্থী রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সে ইদানীং আর কলেজে যায় না। ছেলে একটা মাস্টারির চাকরি পেলেও জয়কেষ্ট বর্তে যেত এই বয়েসে তাকে আর জমির জন্য খেটে মরতে হত না। কিন্তু শুধু নিজেদের সংসার নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই সুধাময়ের। সারা পৃথিবীর দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপেছে যে! এখনকার দিনকালে এক দঙ্গল লোক মিলে যদি কোনও একটা জোয়ান ছেলেকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়, তবে তার পরিণতি একটাই। খানিক বাদে মাঠের মধ্যে কিংবা খাল ধারে পাওয়া যাবে সুধাময়ের লাশ।

একটা গাছের মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জয়কেষ্ট। দামিনীর বুকফাটা কান্নায় সে কী সান্ত্বনা দেবে? দামিনীও তো বুঝেছে, তাই এত কান্না।

এখন বদলা-বদলির যুগ। খুনোখুনি জল-ভাত। যাদের বাপ-চোদ্দপুরুষ কোনওদিন যুদ্ধ করেনি, যাদের কোনও সাহস নেই, তারা দশ-বারোজন মিলে একজন নিরস্ত্র লোককে অনায়াসে মেরে ফেলে। সুধাময়ের দলেব লোকেবাও নিশ্চয়ই অন্য দলের কোনও ছেলেকে বেকায়দায় পেয়ে খুন করেছে। সেই খুনের সময় সুধাময় উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, দলেব তো বটে। হাতের কাছে তাকে পাওয়া গেছে। সুধাময়ের দলের ছেলেরা যখন এ খবর শুনবে, তখন তারা সুধাময়কে বাঁচাবার জন্য একটুও চেষ্টা করবে না, এখন লুকিয়ে পড়বে, মনে মনে বলবে, ঠিক আছে, সুধাকে মারুক না, আমরাও পরে ওদের একটাকে মেরে শোধ নেব।

ছেলের জন্য শোক করবে কী, খিদেয় জয়কেষ্টর পেট জ্বলছে। সকাল থেকে কিছু খায়নি, এখন তার ভাত খাওয়ার কথা। এই

বয়েসে খিদে সহ্য হয় না। ছেলে মরছে বলে কি তার পেটের আগুন চুপ করে থাকবে?

একটা কিছু করা দরকার ঠিকই। পার্টির নেতাদের কাছে যেতে হবে, পুলিসের কাছে যেতে হবে। কিন্তু খিদেয় দুর্বল শরীর নিয়ে জয়কেষ্ট যে এক পা-ও হাঁটতে পারবে না।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলল, দামিনী, ছেলের জন্য কষ্ট সহ্য করতে যদি না পারিস, তা হলে আর কী করবি, মরে যা! তিপ্পান্ন বছর তো বাঁচলি। মায়ের কান্না শুনে খুনোখুনি বন্ধ হয় না। যারা খুন হচ্ছে, এবং পরে আরও যারা খুন হবে, তাদের প্রত্যেকেরই তো মা আছে।

রান্নাঘরে ঢুকে নিজেই সে খেতে বসে গেল।

এ গ্রামে সুধাময়দের দলের কোনও ঘাঁটি নেই। লেখাপড়া জানা ছেলের কী বুদ্ধি, কাছাকাছি কোনও মুরুব্বি না ধরে, সে এগারো মাইল দূরে কলেজপাড়ার দলে নাম লেখাতে গেল! এ গ্রাম থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। নিজের দলের ছেলে না হলে আজকাল কোনও পার্টিই মাথা ঘামায় না। এ গ্রামের নেতা নরেনবাবু। তিনি বলবেন, সুধাময় খুন হয়েছে? ও তো একটা সমাজবিরোধী!

আর পুলিস? নরেনবাবুর পার্টির ছেলে হলে পুলিস তবু ব্যস্ত হবার ভান করত, সুধাময়দের পার্টির নাম শুনলেই পুলিস দাঁত কিড়মিড় করে। নিশ্চয়ই বলবে, যাক গেছে, একটা আপদ গেছে! সমাজবিরোধীর বাবা হিসেবে জয়কেষ্টকেই না গারদে ভরে দেয়!

তবু তো যেতে হবে জয়কেষ্টকে।

রোগাপাতলা চেহারা সুধাময়ের। একসঙ্গে অত লোককে আসতে দেখে সে দিশাহারা হয়ে শূন্য গোয়ালঘরে লুকিয়েছিল। সেখান থেকে চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে বার করা হয়েছে। দামিনী বাধা দিতে এসেছিল, তাকে প্রচণ্ড ধাক্কায় মাটিতে ফেলে বুকের ওপর পা ধরেছিল একজন। উঠোনে ছড়িয়ে আছে দামিনীর ভাঙা কাচের চুড়ি, সুধাময়ের একপাটি চটি, গেঞ্জির ছেঁড়া টুকরো, ঠোঁট থেকে

গড়ানো কয়েক ফোঁটা রক্ত। এখনও কি বেঁচে আছে সুধাময় ?

গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল জয়কেষ্ট।

অনেকের মনেই নেই যে জয়কেষ্টও একসময় জেল খেটেছিল। তার বয়েস কি কম হল? ইংরেজ আমলে, সেই ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় তার বয়েস ছিল সুধাময়ের সমান। জয়কেষ্ট আবশ্য পার্টি-ফার্টিতে নাম লেখায়নি, কিন্তু সেই বিয়াল্লিশ সালে আবেগের একটা জোয়ার এল, কংগ্রেসের নেতারা সবাইকে ডাক দিলেন, সবার ঘরে ঘরে গান্ধীজির ছবি। জয়কেষ্টও মিছিলের সঙ্গে গিয়েছিল আদালত ঘেরাও করতে। কী মার মেরেছিল পুলিস। একটা দৃশ্য জয়কেষ্টর এখনও মনে আছে। এই অঞ্চলে কংগ্রেসের নেতা ছিলেন সত্যময় সেন, কী সুন্দর, সৌম্য চেহারা ছিল তাঁর। অনেকটা যেন সুভাষ বসুর মতন। সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, মাথায় গান্ধী টুপি, মিছিলের একেবারে সামনে ছিলেন তিনি। পুলিস এসে লাঠি চালাল, সত্যময় সেনের কপাল থেঁৎলে গিয়ে রক্তে ভিজে গেল সাদা জামা। তিনি একটুও বিচলিত হলেন না, হাত তুলে সবাইকে বললেন এগিয়ে যাবার জন্য। জয়কেষ্ট অবশ্য মার খায়নি। তবে সত্যময়বাবুর কাছাকাছি ছিল বলে সেও ধরা পড়ে জেল খেটেছিল দুমাস। ছাড়া পাবার পর বাবার ধমক খেয়ে বাড়ি থেকে আর বেরুত না। তারপর তো স্বাধীনতা এল। সত্যময়বাবু তখন বাতে পঙ্গু। এখানকার কংগ্রেসের নেতা হলেন তাঁর ভাই অঘোরনাথ। একদিন জয়কেষ্ট দেখল, সত্যময়বাবুদের বাড়ির সামনে চেয়ার পেতে বসে আছেন দারোগাবাবু, লুচি আর মাংস খাচ্ছেন। শিউরে উঠেছিল জয়কেষ্ট। যে পুলিস সত্যময়-বাবুকে অমনভাবে মেরেছিল, আজ তাঁর বাড়িতেই পুলিসের এত খাতির? পুলিসরা সব গঙ্গাজলে ধোয়া শুদ্ধ হয়ে গেল নাকি? কোথায় কী, এক একটা বছর যায়, জয়কেষ্ট দেখতে পায় পুলিস ঠিক সেইরকমই আছে। কিংবা আগেকার চেয়েও বেশি লোভী! জমিদার-জোতদার-ঠিকাদারদের কথায় ওঠে বসে, গরিবের কথা কেউ শোনে না। অঘোরনাথবাবুরও ঐ সব লোকদের সঙ্গেই ওঠা-বসা। প্রায়ই তিনি থানায় যান। একবার কংগ্রেসের দুটো ছেলে ডাকাতির

দায়ে ধরা পড়ল, অঘোরনাথবাবু দিব্যি তাদের ছাড়িয়ে আনলেন। তারা ড্যাং ড্যাং করে ঘুরে বেড়ায়।

সেই সময় এই তল্লাটে এলেন জীবন ঘোষাল। তখন এখানে কেউ কমিউনিস্ট পার্টির নামও শোনেনি। জীবন ঘোষাল একাই এখানে পার্টির তিনটে শাখা অফিস গড়ে তুললেন, কী পরিশ্রমটাই না করতে পারতেন তিনি। কোথায় খাবেন, কোথায় ঘুমোবেন তার ঠিক নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে-কোনও চাষীর বাড়ির দাওয়ায় শুয়ে থাকতেন। চাষী-মজুর-তাঁতি-জেলেদের তিনি এককাট্টা করেছিলেন, তিনি সব সময় বলতেন, গরিবরা চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাবে নাকি? দিন বদলাচ্ছে, বুঝলি জয়কেষ্ট, চাষী মজুররাই এরপর গভর্নমেণ্ট চালাবে।

একবার জ্বরে পড়ে জীবন ঘোষাল পরপর তিন রাত ছিলেন জয়কেষ্টদের বাড়ি। যেমন জ্বর, তেমনি কাশি। ওষুধপত্তর কিছু খেলেন না, অসাধারণ তাঁর মনের জোর। জীবন ঘোষালের কথা চিন্তা করলে এখনও শ্রদ্ধায় জয়কেষ্টর মাথা নিচু হয়ে আসে। নিজস্ব বাড়ি ঘর, সংসার কিছুই ছিল না তাঁর। পুলিসের হাতে কম মার খেয়েছেন তখন অবশ্য খুনোখুনি ছিল না, কংগ্রেসিরা নানান ছুতোয় তাঁকে গ্রেপ্তার করাত তিন তিনবার জেল খাটলেন, জেল থেকে বেরিয়ে এসেই আরও বেশি উৎসাহে কাজে লেগে পড়তেন। একবার জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখিয়েছিলেন, পুলিস তাঁর ডানহাতের কনুই ছেঁচে দিয়েছিল, সেই হাত আর তুলতে পারতেন না তিনি ভাত খাওয়া অভ্যেস করলেন বাঁহাত দিয়ে।

শেষদিকে থাকতেন পার্টি অফিসে। টি বি রোগের কথা কারুকে জানতে দেননি, মারা গেলেন পঁয়ষট্টি সালে, তার পরের বারের ভোটেই কংগ্রেস এদিকে হেরে ভূত হয়ে গেল। জীবন ঘোষাল তাঁর পার্টির সুদিন দেখে যেতে পারলেন না। পরবর্তী নেতা হলেন বীরেনবাবু। এখন নরেনবাবু। কংগ্রেস আর একবারও জিততে পারেনি, এখান থেকে প্রায় মুছেই গেছে। নরেনবাবুর সঙ্গে এখন পুলিসের খুব দহরম মহরম। দারোগারা হাত কচলিয়ে স্যার স্যার করে। নরেনবাবুর পার্টির ছেলেরা জোর জুলুম করে চাঁদা

তোলে, যাকে তাকে ধরে পিটিয়ে দেয়, পুলিস কিছু বলে না। নরেনবাবুর চেহারাটাও যেন দিন দিন অঘোরনাথবাবুর মতন হয়ে যাচ্ছে!

সুধাময়টা কী বোকা, সে যদি নরেনবাবুর পার্টিতে গিয়ে জুটত, তাহলে কিছুদিনের মধ্যে নেতা-গোছের হয়ে গেতে পারত, পয়সা-কড়িরও অভাব থাকত না। তা নয়। সে গিয়ে জুটল আর এক সর্বহারার পার্টিতে।

জয়কেষ্ট ফিরে এল সাতদিন পর। সুধাময়ের লাশ এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে, কিন্তু তার বাঁচার সম্ভাবনাও কেউ বিশ্বাস করে না। বিভিন্ন পার্টি অফিস, স্থানীয় থানা, সদর থানা মন্ত্রীর দালাল — এইসব জায়গায় ঠোক্কর খেতে খেতে জয়কেষ্টর মন বাড়ি ফেরার জন্য উতলা হয়ে উঠল।

তার বাড়িতে কেউ নেই, দরজা হা-হা করছে। দামিনী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার বড় ভাইয়ের ছেলে সুধীর এসেছিল, দামিনীকে সে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছে। এখন-তখন অবস্থা। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে এরমধ্যে চোরেরা দরজা ভেঙে যা পেরেছে জিনিসপত্র নিয়ে গেছে।

জয়কেষ্ট এসব কিছুই গায়ে মাখাল না। দামিনীকে দেখতে একবার হাসপাতালে তো যেতেই হবে। কিন্তু তার আগে সে তার ফুলের চাষ দেখে যাবে না? ঐ টানেই তো বেশি করে ছুটে এসেছে।

এই সাতদিন আর বৃষ্টি হয়নি, জল দেয়নি কেউ, তবু ফুটে গেছে সব কুঁড়ি। নিজের ফুলের খেতে এসে অভিভূত হয়ে গেল জয়কেষ্ট! এত ফুল সে নিজের হাতে ফুটিয়েছে! পৃথিবীটাই এখন শ্বেতশুভ্র। কী সুন্দর গন্ধ! আর বেশি ফুটে গেলে এ ফুল আর বিক্রি হবে না। বিক্রি করবার তার সময়ই বা কোথায়!

কাশির দমক শুনে সে ঘুরে তাকাল। তালগাছ দুটির ফাঁকে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। ঢ্যাঙা চেহারা, কালো রং, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। আধময়লা পাঞ্জাবি পরা। চিনতে ভুল হল না জয়কেষ্টর। এ তো জীবন ঘোষাল!

মৃত্যুর ওপারের দেশ থেকে এই দিন দুপুরে জীবন ঘোষাল কী করে ফিরে আসবে সে প্রশ্নই তার মনে জাগল না। এইভাবে জীবন ঘোষালকে সে কতবার দেখেছে।

জয়কেষ্ট জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ, জীবনদা?

জীবন ঘোষাল কোনদিন নিজের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলা পছন্দ করতেন না। আজও এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, ছেলেটাকে খুঁজে পেলি না তো, জয়কেষ্ট? পাবি না। এখন ধরে নিয়ে গেলে আর ছাড়ে না। আধমরাও করে না, একেবারে জানে মেরে দেয়। বুকে গুলি করার পরও ছুরি দিয়ে পেট ফাঁসায়। নদীতে ফেলে দিলে লাশও পাওয়া যায় না।

সাতদিনের মধ্যে এই প্রথম দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল জয়কেষ্টর চোখ দিয়ে। এই ক'দিন অন্যদের কথা ঠিক সে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু জীবন ঘোষালের কথা অবিশ্বাস করা যায় না। সুধাময় আর নেই।

একটুক্ষণ জীবন ঘোষালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর সে পটাপট করে কিছু ফুল ছিঁড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বলল, জীবনদা, তোমার মত খাঁটি মানুষ আমি আর দেখিনি। তুমি মরার পর তোমার পায়ে আমি ফুল দিতে পারিনি—

জীবন ঘোষাল বললেন, দূর বোকা! ফুল দিয়ে কী হবে। তুই মরলে কে তোকে ফুল দেবে, কেউ না! ও, তুই নিজেই তো ফুলের চাষ করেছিস! তাহলে এক কাজ কর জয়কেষ্ট, তুই এখানেই মরে যা! আর বেঁচে থেকে কী করবি? তোর ছেলেটা গেছে, বউটারও আর আশা নেই, আর কে আছে? তোদের মতন মানুষদের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ছুরি-ছোরা-বন্দুক-বোমা নিয়ে আর কি লড়তে পারবি? যদি না পারিস—

জীবন ঘোষাল অদৃশ্য হয়ে যাবার পর জয়কেষ্ট শুয়ে পড়ল তার জমিতে। জীবনদা ঠিক সময় এসে ঠিক কথাটা বলে গেছেন। অন্য জায়গায় তার মৃত্যু হলে কে তাকে ফুল দিত! এই তো কী সুন্দর, কী শান্তি, তার নিজের হাতে তৈরি করা ফুল!

জয়কেষ্ট টের পেল, তলার মাটি কাঁপছে।

নদীর মাঝখানে

অনেক লোকজনের ভিড় ঠেলে সেই মেয়েটি এসে অবনীশের পায়ের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রণাম করবার জন্য।

অবনীশ সেই মুহূর্তে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, বেশ চমকে উঠে কিছুটা পিছিয়ে গেলেন। মেয়েটি হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, আমায় চিনতে পারছেন? মনে আছে?

কোনো মেয়েকে মুখের ওপর মনে নেই চিনতে পারছি না বলা যায় না। অবনীশ হাসি হাসি মুখ করে মাথাটা হেলালেন একটুখানি।

হেডমাস্টার ও অন্যান্য কয়েকজন বললেন, আরে পাগল মেয়ে, ওঠ, ওঠ!

মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমার নাম শান্তি, শান্তি সান্যাল। আপনি বর্ধমান বইমেলায় আমার খাতায় চার লাইন কবিতা লিখে দিয়েছিলেন।

অবনীশ এবার খুব নিপুণ মিথ্যে আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, বাঃ, মনে থাকবে না কেন?

হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলোচনা আর জমলো না। অন্যদের দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন অবনীশ। শান্তি মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলতে লাগলো, আঃ, তোমরা ওঁকে অত বিরক্ত করো না, উনি টায়ার্ড হয়ে আছেন। বিকেলবেলা তো উনি মিটিং-এ বলবেনই।

অন্যরা তবু ছাড়তে চায় না, শান্তি তাঁর হাত ধরে টেনে বললো, এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কী করবেন? আসুন, আমার সঙ্গে আসুন!

ইস্কুল বাড়ির সামনের মাঠে মেলা বসেছে। একদিকে ঘুরছে

নাগরদোলা। আর একদিকে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে, বিকেলে সেখানে শুরু হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অবনীশ সেটা উদ্বোধন করবেন।

প্যাণ্ট-শার্টের বদলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন অবনীশ। তিনি ভেবেছিলেন, গ্রামের অনুষ্ঠানে প্যাণ্ট-শার্ট পরাটা মানাবে না। এসে অবশ্য দেখছেন, গ্রামের অনেকেই এখন প্যাণ্ট-শার্ট পরে, ইস্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত, ধুতি প্রায় চোখেই পড়ে না।

ইস্কুল বাড়ির পেছন দিকে একটা ছোট বাগান আর পুকুর। বেশ পরিষ্কার জল। হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এসে শান্তি বললো, আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয়, তখন আমি ছাত্রী ছিলাম।

কিছু একটা কথা খুঁজে পেয়ে অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন কলেজ থেকে পাস করেছো? এখন তুমি কী করো?

শান্ত ফিক করে হেসে বললো, আমাদের এখানেই তো কলেজ আছে। মাত্র তিন মাইল দূরে। সেখান থেকেই পাস করেছি। তারপর এখন বেকার। হাজার হাজার ছেলেমেয়ের মতন! টুকটাক টিউশানি করি।

অবনীশ অনেকদিন কোনো গ্রামের দিকে আসেননি। আজকাল অনেক জায়গাতেই কলেজ হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য শহরে আসতে হয় না। খুব ভালো কথা। গ্রামের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং গ্রামের শিক্ষিত বেকার তৈরি হচ্ছে। গ্রামের মেয়ে টিউশানি করে জীবিকা অর্জন করছে, এটা তাঁর কাছে একেবারে নতুন খবর!

কালো রঙের ছিপছিপে গড়ন শান্তির। মুখখানায় তেমন সৌন্দর্য নেই তবে সপ্রতিভ ভাব আছে। সে কথা বলার সময় অবনীশের চোখের দিকে সোজাসুজি তাকায়।

সে আবার হেসে বললো, আপনি আমাকে মোটেই চিনতে পারেননি, চিনতে পারবেনও না তা জানতুম!

অবনীশ বললেন, তুমি গ্রাজুয়েট মেয়ে, অমন ঢিপ করে পায়ের ওপর আছড়ে প্রণাম করতে গেলে কেন? সেইজন্যই তোমায় চিনতে পারিনি। অত ভক্তির কী আছে!

শান্তি বললো, ঐরকম করতে হলো আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের

জন্য। যদি শুধু অটোগ্রাফের খাতা বাড়িয়ে দিতুম, আপনি আমার মুখের দিকে ফিরেও তাকাতেন না! আপনি কি ভিড় পছন্দ করেন?

—না! একেবারেই না!

—তাহলে এইসব সভা-সমিতিতে আসেন কেন?

—দু' একটা জায়গায় না গিয়ে পারা যায় না। চেনাশুনোরা ধরাধরি করে। তবে, এ জায়গাটায় আমি আগ্রহ করেই এসেছি। অনেকদিন গ্রামের মাটিতে পা দিইনি, খেজুরের রস খাইনি!

—ভাগ্যিস এসেছেন, তাই আপনাকে কাছাকাছি পাওয়া গেল। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আজ রাত্তিরটা থাকছেন তো? কাল সকালে আপনাকে খেজুরের রস খাওযাবো।

—আমার সঙ্গে তোমার অনেক কথা আছে?

—হ্যাঁ। তার আগে একটা অভিযোগ জানাই। আমি আপনাকে অন্তত সাতখানা চিঠি লিখেছি। আপনি মোটে একবার উত্তর দিয়েছেন, সেই প্রথমবার। তারপর একদম চুপ। আমাদের বুঝি চিঠি লিখতে পয়সা খরচ হয় না?

চিঠির প্রসঙ্গে অবনীশের মনে পড়লো। হ্যাঁ, শান্তি সান্যাল নামটা তার চেনা। বেশ বেশ গোটা গোটা হাতের লেখা। চিঠির সঙ্গে একটি-দুটি কবিতা থাকে।

সব চিঠির উত্তর দেওয়া যায় না। শুধু সময়ের অভাবেই নয়। একজনকেই বারবার কী লিখবেন! সাধারণ চিঠি লিখতে ইচ্ছে করে না। প্রায় প্রতিটি চিঠিকেই অসাধারণ করে তোলার প্রতিভা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই ছিল।

চিঠির সঙ্গে যদি কেউ গল্প-কবিতা পাঠায়, তা হলে উত্তর দেওয়া আরও মুশকিল হয়। সেই সব লেখা খারাপ লাগলে মিথ্যে প্রশংসা করা যায় না, আবার সত্যি কথাও বলা যায় না।

শান্তির কবিতাগুলি বেশ কাঁচা। কবি হবার কোনো সম্ভাবনাই তার মধ্যে নেই।

অবনীশ কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, তোমার কবিতাগুলো আমার মনে পড়ছে। তুমি শুধু প্রেমের কবিতা লেখো। কারুর

সঙ্গে তোমার গভীর প্রেম আছে বুঝি ?

শান্তি বললো, ওসব বানানো। গ্রামে আবার প্রেম হয় নাকি ?

—কেন, রাধা-কৃষ্ণও তো গ্রামের ছেলেমেয়ে ছিল !

—কৃষ্ণ কালো, রাধা ফর্সা। এটা মনে নেই ? কালো মেয়েরা প্রেমিকা হতে পারে না। কেউ পাত্তাই দেয় না !

অবনীশ বুঝতে পারলেন, এই প্রসঙ্গটা আর বেশিদূর না টানাই ভালো। শান্তি শুধু বেকার নয়। তার বয়েসী মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবার কথা। বিশেষত গ্রামে। শান্তির বিয়ে হয়নি বোঝাই যাচ্ছে।

পুকুরের ঘাটে বসে অবনীশ একটা সিগারেট ধরাতেই উদ্যোক্তাদেব পক্ষ থেকে দুটি ছেলে এসে বললো, স্যার, আপনাকে আমাদের প্রেসিডেণ্ট একবার ডাকছেন।

শান্তি একজনকে ধমক দিয়ে বললো, আবার ওনাকে বিরক্ত করছিস ? প্রেসিডেণ্টকে বল যে উনি গ্রাম দেখতে বেরিয়ে গেছেন !

অন্যজনকে সে বললো, এই তাপস, তোরা ওনাকে ডেকে নিয়ে এসে শুধু বকাবকি করবি ? উনি কাছাকাছি গ্রাম-ট্রাম একটু ঘুরে দেখতে চান।

তাপস বললো, একটা গাড়িব ব্যবস্থা হচ্ছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ওঁকে নিয়ে বেরুনো হবে। প্রেসিডেণ্ট বলেছেন, বিকেলে তাঁর বাড়িতে স্যারকে চা খেতে হবে।

শান্তি সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, শুনলেন তো। এরা যা ঠিক করবে, আপনাকে তাই করতে হবে ! আপনি প্রেসিডেণ্টের বাড়িতে চা না খেলে তাঁর প্রেস্টিজ থাকবে না।

বাইরে সভা-সমিতি করতে গেলে এরকম কিছু বাধ্য-বাধকতা যে থাকেই, তা কি অবনীশ জানেন না ? তিনি ছেলে দুটিকে বললেন, ঠিক আছে, বিকেলে যাবো চা খেতে। তোমরা ওকে বলে দিও।

ছেলে দুটি চলে যাবার পর শান্তি খানিকটা ঠাট্টার সুরে বললো, আপনি গাড়িতে চেপে গ্রাম ঘুরতে বেরুবেন ?

অবনীশ বললেন, আর কী ভাবে যাওয়া যায় ?

—পায়ে হেঁটে না ঘুরলে কিছুই দেখা হবে না ! আপনি এক-

দেড় মাইল হাঁটতে পারবেন? তাহলে আপনাকে একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি!

—কী রকম চমৎকার জায়গা?

—একটু দূরেই আমাদের গ্রাম। আমাদের বাড়িতে একবার আপনাকে নিয়ে যেতে চাই। একটা নদী পেরিয়ে যেতে হয়। আমাদের গ্রামে এখনো অনেক গাছপালা আছে, এরকম সবুজ গ্রাম আপনি বেশি দেখেননি!

—ঠিক আছে, যেতে পারি। হাঁটতে আমার আপত্তি নেই। সঙ্গে আর কেউ যাবে না?

—আর কারুর যাবার দরকার কী? আপনাকে নিয়ে আমি চুপিচুপি পালিয়ে যাবো। ভয় নেই, ঠিক সময়ে আবার আপনাকে ফিরিয়ে দেবো!

অবনীশ একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। মিটিং করতে এসে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাদাভাবে কোথাও চলে যাওয়া কি ভালো দেখাবে? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাঁর খোঁজ করবে।

শান্তি তাঁর হাত ধরে টেনে বললো, তাহলে দেরি করে কী লাভ, উঠুন!

অবনীশ বললেন, উদ্যোক্তাদের কারুকে একটু খবর দিয়ে এসো।

—কিছু খবর দিতে হবে না। ওরা তো জানেই, আপনি আমার সঙ্গে আছেন। আমাকে সবাই চেনে, ঠিক বুঝতে পারবে।

পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা, তারপর ধানখেত। আলের ওপর দিয়ে শর্টকাট করতে চায় শান্তি। জমিতে এখন সদ্য ধান রোয়া হয়েছে। এরকমভাবে মাঠের মধ্য দিয়ে অনেক দিন হাঁটেননি অবনীশ। ধুতিটা উঁচু করে ধরে রেখে ভাবলেন, প্যান্ট পরে এলেই হতো। চটিতে কাদা লেগে যাচ্ছে। এইসব জায়গায় সবচেয়ে সুবিধে খালি পায়ে হাঁটা।

শান্তির পায়ে রবারের চটি। সেও তার হলদে রঙের শাড়িটা একটু উঁচু করে গুঁজে নিয়েছে। প্রাইভেট টিউশানি করার বদলে ধান রোয়ার কাজ করলেই যেন শান্তিকে বেশি মানাতো। অবশ্য

যে-চাষীরা মাঠের কাজ করে, তারা যে কলেজে পড়াশুনো করতে পারবে না, তারও কোনো মানে নেই।

অবনীশ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কটা টিউশানি করো শান্তি?

—তিনটে। তার মধ্যে এক জায়গায় মাইনে দেয় না। আমার বাবা একজনের কাছ থেকে আড়াইশো টাকা ধার নিয়েছিলেন, আমি তার মেয়েকে পড়িয়ে সেই ধার শোধ নিচ্ছি। এক বছর পড়াতে হবে!

—আজকাল গ্রামের ছেলেমেয়েদেরও বুঝি বাড়িতে মাস্টার লাগে?

—মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে অনেকেই মাস্টার রাখে। ইস্কুলে লেখাপড়া তো বিশেষ হয় না।

—তুমি কবিতা লেখার উৎসাহ পেলে কার কাছ থেকে?

—কেউ উৎসাহ দেয়নি। এমনকি আপনিও কিছু সাহায্য করলেন না। আপনাদের শহরের ছেলেমেয়েরাই বুঝি সবকিছু করবে? কোনো পত্রপত্রিকায় আমাদের চান্স দেয় না।

—দেয় না বুঝি?

—আহা-হা, আপনি তো ভালো করেই জানেন। আপনি নিজেই তো চান্স দেননি আমাকে। কত কবিতা পাঠিয়েছি!

—মুশকিল কি জানো, কবিতার ভাষা খুব তাড়াতাড়ি বদলায়। গ্রামে বসে তোমরা ঠিক বুঝতে পারো না। তোমরা যে কবিতা লেখো, তা বড্ড পুরোনো ভাষায়।

—আমরা তো গ্রামে বসে সব বই আর পত্রপত্রিকা পাই না, আমরা শিখবো কী করে?

—সে সমস্যার সমাধান তো আমি করতে পারবো না। তবে না শিখলে চান্স পাওয়া অসম্ভব। তুমি বরং গল্প-টল্প লেখার চেষ্টা করতে পারো। কবিতার চেয়ে গল্প লেখা বোধহয় সহজ।

—গল্প লেখা সহজ? তাহলে তো সবাই গল্প লিখতো?

কোনাকুনি একটা ধানখেত পার হয়ে ওরা একটা আমবাগানে ঢুকলো। এই বাগানটা আগে বেশ বড় ছিল বোঝা যায়, এখন ভেতরে ভেতরে বাড়ি উঠছে। এক জায়গায় একটা গাছ কেটে তার

ডালপালা চাপানো হচ্ছে একটা গোরুর গাড়িতে।

বাগানটার পাশেই নদী।

সেই নদীটি দেখে অবনীশ প্রথমে অবাক, তারপর খুশি হলেন। এরকম একটা নদী তিনি আশাই করেননি। অধিকাংশ নদীই তো এখন মজে-হেজে গেছে। এই শীতকালে প্রায় কোনো নদীতেই জল থাকে না। কিন্তু এই নদীটিতে বেশ জল আছে, স্রোত আছে। বেশ টলটলে জল, দু'পাশে উঁচু পাড়। বেশ একটা ঝকঝকে তকতকে ভাব।

অবনীশ বললো, বাঃ, বেশ সুন্দর তো!

শান্তি বললো, বলেছিলাম না আপনার ভালো লাগবে! ওপাশে আমাদের গ্রাম। আমাদের বাড়িটা কিন্তু মাটির বাড়ি।

—আমার জন্মও মাটির বাড়িতে।

—আপনি গ্রামে জন্মেছিলেন?

—হ্যাঁ। তবে গ্রাম ছেড়েছিও বহু বছর হয়ে গেল।

—চলুন, আমাদের বাড়িতে আপনাকে মুড়ি আর পাটালিগুড় খাওয়াবো। নিশ্চয়ই অনেকদিন খাননি। আপনারা তো সকালে স্যাণ্ডুইচ খান, তাই না?

—কলকাতায় মুড়ি আর পাটালিগুড় দুটোই পাওয়া যায় তবে, অনেকদিন মুড়ি-পাটালিগুড় একসঙ্গে খাইনি তা ঠিকই। আমি কোনোদিন স্যাণ্ডুইচ খাই না। মুড়ির সঙ্গে ডিমভাজা খাই।

জলের কাছে এসে অবনীশ বললেন, কাছাকাছি কোনো ব্রিজ নেই তো দেখছি, এদিক থেকে ওপারে যায় কী করে?

—খেয়া নৌকো আছে। দেখি, মাঝি কোথায় গেল!

ঘাটে দু' তিনটে নৌকো বাঁধা। কিন্তু কাছাকাছি কোনো মানুষজন দেখা গেল না। একটু দূরে একটা দোকানঘর, শান্তি সেদিকে খোঁজ নিতে গিয়েও ফিরে এলো। খেয়া নৌকোর মাঝি সেখানে নেই। কেউ বলছে, তার নাকি খুব জ্বর, অন্য একজনের আসবার কথা।

শান্তি বললো, আসুন নৌকোয় উঠে বসি।

নৌকোয় ওঠার কায়দাটা একেবারেই ভুলে গেছেন অবনীশ।

তিনি আনাড়ির মতন গলুইতে পা দিতেই নৌকোটা সরে গেল, তিনি আর একটু হলে আছাড় খাচ্ছিলেন। শান্তি শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধরে ফেলে হাসিতে একেবারে নুয়ে পড়তে লাগলো। অবনীশের মতন একজন খ্যাতিমান মানুষকে লজ্জায় পড়তে দেখে সে বেশ মজা পেয়েছে।

নৌকোর খোলে বেশ খানিকটা জল জমা রয়েছে। শান্তি একটা ভাঙা মগ দিয়ে জল ছেঁচতে লাগলো। অবনীশ বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন। তিনি যে এখন আটান্ন বছর বয়স্ক একজন ভারিক্কী মানুষ, সেটা মাঝে মাঝে ভুলে যান।

শান্তি বললো, আমি নৌকো চালাতে পারি, জানেন? মাঝির জন্য বসে না থেকে, আমিই আপনাকে ওপারে নিয়ে যেতে পারি। যাবো?

কিছু না ভেবেই অবনীশ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শান্তি প্রায় বালিকার মতন খুশি হয়ে দড়ি খুলে দিল। তারপর বৈঠা জলে ডুবিয়ে বললো, আমি ভালো কবিতা লিখতে পারি না বটে, কিন্তু গোরুর দুধ দুইতে পারি, কাসুন্দি বানাতে পারি, বড়ি দিতে পারি, এমনকি গাছেও উঠতে পারি।

অবনীশ স্মিত হেসে শান্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এত গুণের মেয়ে, অথচ তার বিয়ে, হচ্ছে না শুধু গায়ের রং কালো বলে? নিশ্চয়ই ওর বাবার পণ দেবার সাধ্য নেই। অপমানজনকভাবে বিয়ে করার চেয়ে এরকম একটা মেয়ে কুমারী অবস্থাতেও তো কাটিয়ে দিতে পারে সারাজীবন!

কিন্তু বিয়ে না হোক, একজন প্রেমিকও থাকবে না? তখন প্রেমের প্রসঙ্গ তুলতে শান্তি চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। মেয়েটি এমনিতে বেশ হাসিখুশি হলেও ওর কোনো গোপন দুঃখ আছে। সে কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। ওর কবিতাগুলিকে তিনি নিতান্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর ভেবেছিলেন, কিন্তু সেগুলি রচনার পিছনে আছে এক যুবতীর অকপট হৃদয়বেদনা।

বেশ ভালোই বৈঠা চালাতে পারে শান্তি। নৌকোটা হেললো-

দুললো না, ঘুরে গেল না, সোজাই এগোলো। অবনীশের মুখোমুখি বসেছে শান্তি, আঁচলটা জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। এখন, এই ভূমিকায় তার মুখে একটা অন্যরকম সৌন্দর্য এসেছে।

ষড়যন্ত্র করার মতন মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে শান্তি ফিসফিস করে বললো, নৌকোটা যখন পাওয়াই গেছে তখন এটুকু গিয়ে কী হবে? আরও খানিকটা ঘুরবেন? ঐ যে দূরে তালগাছটা দেখছেন, ঐ পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনতে পারি। যাবেন?

এ ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিংবা না বলা উচিত, তা ভেবে পেলেন না অবনীশ। আর কেউ নেই, শুধু একটি মেয়ের সঙ্গে নৌকোয় করে বেড়ানো তো আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু সেটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না? এই রকম গ্রাম দেশে নিশ্চয়ই এ নিয়ে কথা উঠবে। অবনীশ তো ফিরে যাবেন আগামীকাল, তারপর যদি শান্তির ওপর অত্যাচার হয়?

কিন্তু অবনীশ তাঁর লেখার মধ্যে কোনোরকম সংস্কারকে প্রশ্রয় দেন না। নারী-পুরুষের সহজ মেলামেশায় বিশ্বাস করেন। তিনি একটি মেয়ের আহ্বানে সাড়া দেবেন না!

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা তো খেয়ার নৌকো, অন্যদের লাগবে না?

—অন্যরা না হয় একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকবে।

—না, চলো, ওপারে গিয়ে তোমার বাড়িটাই ঘুরে আসি। মুড়ি আর গুড় খাওয়াবে বললে যে !

—এই যাঃ! ধরুন, ধরুন!

বৈঠাটা শান্তির হাত থেকে খসে জলে পড়ে গেল, না শান্তি ইচ্ছে করে ফেলে দিল? বেশ স্রোত আছে, হাত বাড়িয়েও সেটা ধরা গেল না। এবার নৌকোটা ঘুরতে লাগলো।

শান্তি বললো, এখন আমরা ভাসতে ভাসতে যেখানে খুশি চলে যাবো! আর ইচ্ছে করলেও ফেরা যাবে না!

অবনীশ বিরক্ত হবার বদলে হালকাভাবে হাসলেন। হঠাৎ একটি মেয়ে তাকে ভিড় থেকে টেনে নিয়ে এলো, তারপর নদীর বুকে তাঁর সঙ্গে নৌকোয়, এই নৌকো আপন মনে ভাসবে! এ যেন এক

প্রেমের দৃশ্য !

বয়েসটা আর একটু কম হলে আরও উৎসাহিত হওয়া যেত। শান্তির সঙ্গে তাঁর বয়েসের তফাত প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর তো হবেই। কেউ তাঁকে শান্তির প্রেমিক ভাববে না ভুলেও। অন্যদের চোখে তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি! তাঁর বদলে অন্য কারুর সঙ্গে শান্তির এই পাগলামির খেলাটা খেলা উচিত ছিল।

সেরকম তো চওড়া নদী নয়, অকূলে ভেসে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। দু' পাড়ে কিছু কিছু লোক জমছে। তারা এই দৃশ্য দেখছে।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, এই শান্তি, নৌকোটা এদিকে নিয়ে এসো!

শান্তি অবনীশকে বললো, ওদের কথা শুনবেন না। ওদিকে তাকাবেন না!

অবনীশ মনে মনে বললেন, আমি বেদব্যাস, তুমি মৎস্যগন্ধা?

ক্রমে চ্যাঁচামেচি বাড়তে লাগলো। নদীর বুকে একটা নৌকোয় শুধু একটি নারী ও পুরুষ আপন মনে বসে আছে, এই দৃশ্য অন্যদের সহ্য হয় না! অবনীশও বেদব্যাস নন, চারপাশে কুয়াশার আড়াল সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

এক সময় শান্তি চেঁচিয়ে বললো, ফিরতে পারছি না। বৈঠা ভেসে গেছে!

এবার আর একটা নৌকো এগিয়ে এলো। তাতে দু'জন মানুষ। একজন নৌকোটা চালাচ্ছে, অন্যজন দাঁড়িয়ে রাগত সুরে বলতে লাগলো, এই শান্তি, তুই কার হুকুমে এই নৌকো নিয়ে এসেছিস? খেয়ার নৌকো নেবার অর্ডার তোকে কে দিয়েছে? কলকাতা থেকে ভদ্রলোক এসেছেন, যদি নৌকো উল্টে যেত?

অবনীশ সে ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন না। এক সময় তিনি ভালোই সাঁতার জানতেন। সাঁতার কেউ ভোলে না। ধুতি-টুতি নিয়ে একটু অসুবিধে হতো বটে কিন্তু তিনি জলে ডুবে যেতেন না!

শান্তি সেই লোকটিকে বললো, তুমি এত ধমকাচ্ছো কেন,

তোমার নৌকো এনেছি নাকি ?

লোকটি দাঁত কিড়মিড় করে বললো, তোর বড্ড বাড় বেড়েছে না ?

শান্তি অবনীশের দিকে তাকিয়ে বললো, আমরা বেড়াচ্ছিলুম তো, তাই ওদের হিংসে হয়েছে।

দুটো নৌকো গায়ে গায়ে লাগলো। সেই লোকটি আবার বললো, শান্তি, তুই কারুকে কিছু না বলে কেন এনাকে নদীতে নিয়ে এসেছিস ?

শান্তি বললো, বেশ করেছি ! তুমি বেশি চোখ রাঙাবে না বিশুদা !

তখন সেই বিশুদা নামের যুবকটি ঝুঁকে এসে ঠাস করে একটা চড় কষালো শান্তির গালে।

অবনীশ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী কাণ্ড ? কিন্তু তিনি কিছু প্রতিবাদ করার আগেই শান্তিও উল্টে চড় লাগাতে গেল যুবকটিকে, দু'জনের ঝটাপটিতে নৌকো এবার সত্যি উল্টে যাবার যোগাড় !

তা অবশ্য হলো না। অন্য নৌকোচালকটির বকুনিতে দু'জনেই থেমে গিয়ে ফুঁসতে লাগলো। অবনীশ আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন।

সভার উদ্যোক্তাদেরও দু'জন ছুটে এসেছে নদীর ধারে। এদিকে নৌকো ভিড়তেই তারা শান্তিকে খানিকটা বকাবকি করে, অবনীশের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে নিয়ে গেল ইস্কুলবাড়িতে। সেখানে আলাদা একটি ঘরে তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা।

শান্তির বাড়িতে আর যাওয়া হলো না, শান্তির সঙ্গে আর দেখাও হলো না। বিকেলের মিটিং-এর সময়ও শান্তি নেই। অভিমান হয়েছে তার ? তা তো হতেই পারে। কিন্তু শান্তিকে যে চড় মারা হয়েছে, তা নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য নেই, কেউ সে বিষয়ে আলোচনাও করছে না।

সন্ধের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সবটা বসে বসে দেখতে হলো অবনীশকে। খুব যে ভালো লাগছে তা নয়, কিন্তু ভদ্রতা করে বসে থাকতেই হয়। এক সময় তিনি সিগারেট টানবার জন্য

বাইরে এলেন।

বেশ বড় মাঠ, পেছন দিকে লোকজন রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। অবনীশ হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এলেন। একেবারে পেছন দিকে, আধো অন্ধকারে দুটি নারী ও পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। অবনীশ সেদিকে আর এগোতে চাইলেন না।

হঠাৎ একটা হাসির শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠলেন। হাসিটা চেনা। শান্তি!

অবনীশ এক পলক তাকিয়ে দেখলেন তার পাশের যুবকটি সেই বিশুদা। ওদের দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

আজ দুপুরের ঘটনার পরেই ওদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতা হলো? শান্তির কবিতা ছাপাতে পারেননি অবনীশ, তবু তিনি তাঁর এই উপকারটা অন্তত করতে পেরেছেন। কবিতার চেয়ে প্রেম অনেক বড় নয়?

আরও একটা ব্যাপারে অবনীশের কিঞ্চিৎ সুখ বোধ হলো। শান্তি তাঁকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল বলেই ঈর্ষা হয়েছিল ঐ বিশু নামের ছেলেটির? তাহলে, এতটা বয়েস হলেও, তিনি পুরোপুরি বুড়োদের দলে চলে যাননি, যুবকেরা এখনো তাঁকে ঈর্ষা করে!

কল্পনার নায়ক

নতুন করে বানানো হচ্ছে সিঁড়িটা। আগেকার মোজেইক খুবলে খুবলে তুলে সেখানে বসানো হচ্ছে সাদা মার্বেলের স্ল্যাব। একটু চওড়াও করা হচ্ছে। পুরোনো রেলিংগুলোও খুলে ফেলে লাগানো হবে কাস্ট আয়রনের নিজস্ব, নতুন ডিজাইন।

কয়েকটা দিন ওঠানামা করতে খানিকটা অসুবিধে হবে। তলার দিক থেকে একটা একটা ধাপ বদলানো হচ্ছে। বাড়ির বাচ্চারা লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া আসা করে, কিন্তু গৃহিণীর পক্ষে খুব মুশকিল। শরীরটা সাংঘাতিক ভারী হয়ে গেছে এই চুয়াল্লিশ বছর বয়েসেই, কোমরের ওপর দিকটা ঠিক বোঝা যায় না, কিন্তু নিতম্ব দুটি ঢিবির মতন, আর উরুদ্বয় সত্যিই কলাগাছের সঙ্গে উপমেয়। এমনিতেই হাঁটার সময় তার দুই উরুতে ঘষাঘষি লাগে। প্রথম দিন বাড়ির দুই দাসী ও তার দুই মেয়ে ঠেলাঠেলি করে তাকে ওপরে তুলে দিয়েছিল, তারপর থেকে সাবিত্রী আর নিচেই নামছে না। পাঁচ-সাত দিন আর বাড়ির বাইরেই যাবে না ঠিক করেছে।

বাড়ির কর্তার অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই। বাহান্ন বছর বয়েস, কিন্তু শরীর এখনো টনকো। মেদ নেই এক ছিটে, দৈর্ঘ্য ছ'ফিটের চেয়ে একটু কম। সে অনেক সময় একবার পা বাড়িয়েই ডবল সিঁড়ি অতিক্রম করে।

সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় খটাখট শব্দ। মিস্তিরি লাগানো হয়েছে চারজন, আর একজন সুপারভাইজার। সে রীতিমতন পাশ করা আর্কিটেকট। কাজ শেষ করতে হবে পাঁচ দিনের মধ্যে। শুধু মার্বেল বসালেই তো হবে না, এরপর ঘষাঘষি আছে। পালিশ করতে হবে।

পুরোনো বাড়ি এরকম ভাঙাচোরা করবার বদলে একটা একেবারে নতুন বাড়ি বানিয়ে নিলেও চলতো, যার সব কটি ঘরের

মেঝে ও সিঁড়ি মার্বেলের। তাতে অসুবিধে ছিল না কিছু। কিন্তু ডালিমতলার এই বাড়িটা খুব পয়মন্ত। এটাকেই বসতবাড়ি হিসেবে রাখতে চায় অরুণ, তাই পুরনো অনেক কিছুই বদলে নিচ্ছে।

দুপুরের দিকে অরুণ হঠাৎ ফিরে এলো ডালিমতলার বাড়িতে।

সারাদিন তার ব্যস্ততার শেষ নেই, তার কোনো ছুটির দিনও নেই। কলকাতায় তার তিনখানা অফিস, হাওড়া ও ঠাকুরপুকুরে দুটি কারখানা। কখন সে কোথায় থাকবে, তা মাত্র ঘনিষ্ঠ দু' একজন জানে। আবার কারুকেই কিছু না জানিয়ে সে যখন তখন বাড়িতেও ফিরে আসতে পারে।

বাড়ির চারপাশে দেড়-মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল, তার ওপর কাঁটাতার। সামনের গেটটা পুরু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি, অর্থাৎ বাইরে থেকে ভেতরের কিছুই দেখা যাবে না। সেই গেটের তলার দিকে কাটা আছে ছোট দরজা, বাড়ির কাজের লোকরা সেখান দিয়ে যাতায়াত করে। গেটের ভেতরের দিকে একপাশে আছে একটা ছোট্ট গম্বুজ ঘর, সেখানে থাকে দুজন গাড়োয়ালি আর্মড গার্ড। এ বাড়ির যে সবুজ ঘাসের লন আর দুপাশের বাগান, তাও পথচারীদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করা।

মার্সিডিজ গাড়ির চেনা হর্ন শুনে গার্ডরা খুলে দিল গেট। এ গাড়ির জানলাগুলোতে অস্বচ্ছ স্মোকড গ্লাস বসানো, আরোহী-দের দেখবার উপায় নেই। গাড়িটি পোর্টিকোতে থামবার পর একজন আর্দালি দৌড়ে এসে খুলে দিল পেছনের দরজা, প্রথমে ব্যাগ হাতে নামলো স্বরূপচাঁদ, তারপর অরুণ। ক্রিম রঙের 'সাফারি সুট পরা, চোখে সান-গ্লাস, তার চেহারার সঙ্গে পতৌদির নবাবের অনেকটা মিল আছে।

ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে সে সামনের বারান্দাতে উঠতেই ডান দিকের ঘর থেকে একজন বেঁটে মতন কর্মচারি বেরিয়ে এসে বললো স্যার, টেলিফোন।

অরুণ তাতে একটুও অবাক হলো না।

সে বারান্দার কোণে হাসনুহানার ঝাড়টার কাছে গিয়ে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো। কর্মচারিটি তাকে এনে দিল কর্ডলেস ফোনের রিসিভার। নিম্নস্বরে সে ঠিক এক মিনিট কথা বলার পর ফোনের সুইচটা অফ করে ফিরিয়ে দিল কর্মচারিটির হাতে। তারপর ঢুকে গেল ভেতরে।

সিঁড়ির মুখে এসে সে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ দেখলো। আর্কিটেক্ট ভদ্রলোক এসে বিগলিতভাবে বললো, স্যার, ফার্স্ট ফ্লোরটা আজই কমপ্লিট করে ফেলবো, আমি আশা করছি, ঠিক সময়েই—

অরুণ লোকটির দিকে তাকালো না, কোনো মন্তব্যও করলো না।

মিস্ত্রিরা কাজ থামিয়ে সরে গেল তাকে দেখে। প্রথম পাঁচ ধাপ টকটক করে উঠে এলো অরুণ। তারপর জোড়া পায়ে এক লাফে পার হয়ে গেল অসমাপ্ত, কাঁচা ধাপটা। ঠিক কোনো খেলোয়াড়ের মতন। দেখলে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মিস্ত্রিরা এমন প্রগল্ভতা দেখাতে পারে না।

দোতলায় সাতখানা ঘর। একসময় এখানে থাকতেন অরুণের দাদা, তিনি বছর দু-এক আগে মারা গেছেন। তাঁর বিধবাকে অরুণ স্থানচ্যুত করেনি, বরং দূরসম্পর্কের এক বিধবা দিদিকেও এখানে এনে রেখেছে। সাবিত্রীর এতে আপত্তি ছিল, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-নামতে তার হাঁপ ধরে। এই বিধবাদের তিনতলায় পাঠিয়ে সে নেমে আসতে চেয়েছিল দোতলায়। কিন্তু অরুণের তিনতলাই পছন্দ, সে সবচেয়ে ওপরে থাকতে চায়। সাবিত্রীকে সে আশ্বাস দিয়েছে, সিঁড়ির কাজটা শেষ হলেই সে পাশে একটা লিফট বসাবার ব্যবস্থা করবে। একটু ভুলই হয়ে গেছে, আগে লিফ্ট বসিয়ে তারপর সিঁড়ি ভাঙাভাঙির কাজ শুরু করা উচিত ছিল।

দোতলার একটা ঘর অবশ্য অফিস ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে কাজ করে চারটি মেয়ে। অন্দরমহলে স্বরূপচাঁদ ছাড়া আর কোনো পুরুষ কর্মচারির প্রবেশের অনুমতি নেই।

অরুণ দোতলায় উঠতেই অফিস ঘর থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে

এসে বললে, স্যার, আপনার টেলিফোন।

প্রত্যেক তলায় সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর কাছে একটা গোল ব্যালকনি। তারপর টানা বারান্দা। অরুণ এবার গিয়ে দাঁড়ালো ব্যালকনিতে। একটা কদমগাছ হঠাৎ লম্বা হয়ে এ বছরই ছাড়িয়ে গেছে দোতলার উচ্চতা। এই বর্ষায় অনেক ফুল ফুটেছে। অরুণ সেই ফুল দেখলো না। মেয়েটি রিসিভারটি এনে দিতে সে পাঁচিলের বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে লাগলো। তার মুখখানা বেশ প্রফুল্ল। এবারেও সংক্ষেপে কথা শেষ করে সে বললো, অলরাইট, অলরাইট! নো প্রবলেম!

এককালে বাংলার মফস্বলের জমিদাররা কলকাতা শহরে একখানা বাড়ি বানিয়ে রাখতো। তখন জমির দামের কোনো পরোয়া ছিল না, অঢেল জায়গা, বড় বড় ঘর, লম্বা-চওড়া বারান্দা, বাড়ির মানুষদের চেয়েও ঘরের সংখ্যা বেশি রাখাই ছিল রেওয়াজ। সে সব জমিদাররা আর নেই, বাড়িগুলোও হাতবদল হয়ে গেছে। এই বাড়িটা কেনার পর থেকেই অরুণদের পরিবারে সৌভাগ্যের ডালপালা ছড়িয়ে পড়ে অনেক দূর।

তিনতলার ব্যালকনিতে একটি ডেকচেয়ারে বসে আছে এক তরুণী। তেইশ বছর বয়েস। তার শরীরটি বাঁশপাতার মতন পাতলা। চিনে বাদামের গায়ের পাতলা খোসার মতন রঙের একটা শাড়ি পরে আছে সে, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার কোলে একটা বই।

আকাশ মেঘলা আজও। গত দুদিন প্রবল বৃষ্টি হয়েছে, আজকের আকাশ এখনো মনস্থির করতে পারছে না, তবে রোদের সম্ভাবনা আর নেই।

মেঘলা দিনে শহরের আওয়াজ যেন কম মনে হয়। পৃথিবী শান্ত। তিনতলার ঝুলবারান্দায় বই হাতে নিয়ে বসে আছে একাকিনী এক তরুণী। কদমগাছের ডগাটা উঁকি মারছে তার পাশে। যেন ছবির দৃশ্য।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে অরুণ থমকে দাঁড়ালো। তার মাথার মধ্যে সব সময় একশো রকম কাজের কথা ঘোরে, কিন্তু এই মুহূর্তে

সব ভুলে গেল সে। তার মুখটা কোমল হয়ে গেল স্নেহে। তার বুকের মধ্যে কষ্ট হতে লাগলো।

মেয়েটি বই থেকে চোখ তুলে ঘাড় ফেরালো এদিকে। বাবাকে দেখে সে হাসলো।

অরুণ নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, রুমা, তুই এখানে বসে আছিস? কাল তোর গায়ে জ্বর ছিল। ঠাণ্ডা লাগবে না?

রুমা হাসিমুখেই মাথা নাড়লো দু'দিকে।

অরুণ বললো, বৃষ্টি নামল ভিজিস না কিন্তু। কী বই পড়ছিস?

সঙ্গে সঙ্গে রুমা তার হাতের বইখানা ছুড়ে দিল রেলিং-এর বাইরে। সেটা একটা ডানাভাঙা পাখির মতন গিরে পড়লো পেছনের বাগানে।

রুমার মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। যেন সাঙ্ঘাতিক কোনো ভয়ের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে সে, কুঁকড়ে যেতে লাগলো তার চামড়া, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মাথাটাকে পেছনে দিকে হেলিয়ে নিতে নিতে সে দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

বিস্ময়ে উৎকট হয়ে গেল অরুণের মুখভঙ্গি। একটা বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করে কী এমন দোষ করেছে সে? বইয়ের নাম সম্পর্কে তার যে বিশেষ কিছু আগ্রহ আছে তাও নয়, নেহাত-ই কথার কথা। তাতেই রুমা বইটা ছুড়ে ফেলে দিল?

কাছে এগিয়ে এসে সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে, কেয়া হুয়া বেটি?

রুমা হাত না সরিয়ে কান্না-কাঁপা গলায় উত্তর দিল, কুছ নেহি!

অরুণ বললো, মু উঠাও! আঁখ খুলো!

রুমা তবু মুখ তুললো না।

অরুণ জোর করে রুমার হাত দুটি ছাড়িয়ে, তার থুতনি উঁচু করে ধরলো।

রুমার চোখ দুটি জলে ভরা, ঠোঁট অস্বাভাবিক রকমের কাঁপছে।

অরুণ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেয়া দেখা তুমনে? বোলো! বোলো!

রুমা জোরে জোরে দুদিকে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো। সে যেন কথা বলতে পারছে না।

দু' তিনবার এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেও কোনো উত্তর না পেয়ে অরুণের ইচ্ছে হলো মেয়ের গালে একটা চড় কষাতে। কিন্তু নিজের দমন করে সে বিরক্তির সঙ্গে বললো, ওফ্!

ব্যালকনির রেলিং-এ হেলান দিয়ে আচ্ছন্নের মতন বসে রইলো রুমা।

অরুণ বারান্দায় এসে চেঁচিয়ে ডাকলো, লছমী, লছমী!

একজন আয়া শ্রেণীয় মাঝবয়েসী নারী বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে।

অরুণ তাকে বললো, দ্যাখোগে, রুমাজীর আবার তবিয়ৎ খারাপ হয়েছে!

প্রধান শয়নঘরটি বারান্দার শেষ প্রান্তে। তার আগে আর একটি ঘর শুধু জুতো ছাড়ার জন্য। তিন দিকের র‍্যাকে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জোড়া জুতো ও চটি সাজানো। অরুণের জুতোর শখ। ইতালিয়ান বালি কোম্পানি থেকে সে অর্ডার দিয়ে শু বানিয়ে আনায়।

এই ঘরে এসে জুতো খুলতে খুলতে অরুণ আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগলো। মুখ থেকে বিরক্তির ছাপটা কিছুতেই মুছছে না। রুমার সঙ্গে তার কথা বলার কোনো দরকার ছিল না। এখন সে বাড়িতে ফিরেছে দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্য। মেজাজ বিগড়ে গেলে কি আর ঘুম আসবে!

হরিণের চামড়ার চটি পরে সে এলো এবার শোবার ঘরে। এ ঘরের সবকিছুই গোলাপি রঙের। পর্দার রঙ, বিছানার চাদরের রঙ তো বটেই, এমনকি দুটো স্টিলের আলমারিও ঐ রঙের।

পালঙ্কের ওপর বসে আছে সাবিত্রী, সে একমনে টি ভি-তে একটা ফিলম দেখছে। সাবিত্রী বই পড়ে না, সে মোটামুটি লেখা-পড়া জানলেও বই কিংবা পত্রপত্রিকা পড়া সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র

ঝোঁক নেই, কিন্তু টি ভি দেখতে, রেডিও শুনতে সে খুব ভালো-বাসে। কোনো কোনোদিন সে তিন-চারখানা ভিডিও ক্যাসেট শেষ করে।

অরুণকে দেখামাত্র সাবিত্রী রিমোট কণ্ট্রোলে টি ভি বন্ধ করে দিল। অরুণ যে কোনোরকম কৃত্রিম শব্দের বিরোধী।

অরুণ তার স্ত্রীর কাছে মেয়ের নামে নালিশ জানালো না। মেয়ের কথা উল্লেখও না করে বললো, আজ রাতে আমায় দিল্লি যেতে হবে, সেখান থেকে মস্কো। পাঁচ দিন পরে ফিরবো। তুমি কি দিল্লিতে তোমার পিতাজীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

সাবিত্রী দু'দিকে মাথা নাড়ালো।

অরুণ খানিকটা জোর করে হেসে বললো, তুমি আমার সঙ্গে দিল্লি পর্যন্ত যেতে পারো। মস্কোর ঠাণ্ডা তোমার সহ্য হবে না।

সাবিত্রী বললো, না, আমার তবিয়ৎ ঠিক নেই, এখন প্লেনে চাপতে পারবো না।

অরুণ কাছে এসে সাবিত্রীর কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, সামান্য জ্বর। ডাক্তার কুসুম পাণ্ডেকে একবার আসতে বলো।

পালঙ্কের ওপর উঠে সাবিত্রীর পাশে শুয়ে পড়ে সে আবার বলল, আজ সারারাত আমার ঘুম হবে না। দিল্লিতে অনেক কাজ, তুমি এখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও!

সাবিত্রী একটু সরে গিয়ে অরুণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতা। এত ব্যস্ত স্বামী ওর সময়ের কত দাম, তবু ঘুমোবার জন্য সে দুপুরবেলাতেও স্ত্রীর কাছে চলে আসে।

চোখ বুজে অরুণ বললো, আমার হ্যাণ্ডব্যাগে সাড়ে চার লাখ টাকা আছে। ক্যাশ! এই ঘরের আলমারিতে রেখে দেবে। বাড়িতে তোমার কিছু গয়না রাখতে বলেছিলাম, রেখেছো?

সাবিত্রী বললো, হাঁ জী। পরশুদিন কিষণলালের মেয়ের শাদী আছে।

অরুণ বললো, কিছু গহনা, এই ধরো কুড়ি-পঁচিশ ভরি, একটা পুঁটলি করে, পলিথিনের প্যাকেটে মুড়ে, বাথরুমের

সিস্টার্নের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে দেবে।

সাবিত্রী চমকে উঠে বললো. কেন? কেন?

অরুণ বললো, কাল ভোরবেলা ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা এ বাড়ি রেড করবে। খুব সম্ভব।

সাবিত্রী এবার আতঙ্কিত হয়ে বললো. বাড়ি রেড করবে? তাহলে এত টাকা, এই সব গয়না আপনি ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিন!

অরুণ বললো. তাতে কোনো লাভ হয় না।

সাবিত্রী বললো, তবে স্বরূপচাঁদের হাত দিয়ে বম্বেতে পাঠিয়ে দিলে হয় না?

অরুণ বললো. বম্বেতে বুঝি ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা বসে নেই? আমি যা বলছি মন দিয়ে শুনে রাখো। টাকা রাখবে আলমারিতে, কিছু গয়না রাখবে বাথরুমে। আমি চাই, ওরা সব টাকা আর গয়না খুঁজে পেয়ে সঙ্গে নিয়ে যাক। বাথরুমের সিস্টার্নে ওরা নিজেরাই উঁকি দেবে সবচেয়ে আগে।

—ওরা সব নিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ। ওদের দিতে হবে। চার-পাঁচজন অফিসার আসবে, কিছু খুঁজে না পেলে তারা রাগ করবে না? তাদের মানে লাগবে। আমার মতন এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে পাঁচ-ছ'লাখ টাকার জিনিস থাকবে না?

এমনি এমনি এত সব নিয়ে যাবে? আমার গয়না?

—লিস্ট বানিয়ে নেবে। তোমাকে দিয়ে সই করাবে। বাড়িতে রেড করলে এমনি এমনি নেবে না। তোমার গয়না আবার সব হবে। ওরা আমার কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?

—বলবো আপনি বাইরে গেছেন!

অরুণ এবার খানিকটা ধমকের সুরে বললো, শুধু বাইরে? বলবে, আমি দিল্লি হয়ে মস্কো গেছি! সত্যি কথা বলবে! বলবে, বাড়িতে ক্যাশ টাকা রাখা হয়েছে বাড়ির রিপেয়ারিং খরচের জন্য। বলবে বাথরুমে গয়না লুকিয়েছ ভয় পেয়ে। মনে থাকবে?

—জী, মনে থাকবে।

অরুণ এবার পাশ ফিরলো। তারপর সত্যি সত্যি ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এলো।

॥ দুই ॥

উলুবেড়িয়ার কাছে গঙ্গার ধারে একটা খুব পুরোনো সাহেবী আমলের বাড়ি। এককালে এটা একটা জুট মিলের ইংরেজ মালিকের বাসভবন ছিল। অরুণ বাড়িটা কিনেছে দু'বছর আগে, কিন্তু ইচ্ছে করে সারায়নি এখনো। পুরোনো সম্পত্তি কিনতে তার ভালো লাগে। কিন্তু এই সম্পত্তিটাকে কোন কাজে লাগানো হবে, তা সে এখনো ঠিক করতে পারেনি।

শুধু বাড়িটার চারপাশের বাউণ্ডারি ওয়ালটা সে মজবুত করেছে, যাতে বাইরের লোক ঢুকতে না পারে। দারোয়ান ও মালি আছে। গঙ্গার দিকের একখানা ঘর শুধু সাজিয়ে বসবাসযোগ্য করা আছে, সেখানে অরুণ মাঝে মাঝে আসে।

সে অবশ্য এই ঘরখানা আনন্দ-ফুর্তি'র জন্য ব্যবহার করে না। তার মদ্যপানের নেশা নেই, তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নেই। কলকাতা বা কাছাকাছি কোথাও নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতেও তাকে কেউ দেখেনি।

গঙ্গার শোভা দেখার মতন চোখও তার নেই। সে এখানে এমনিই আসে, কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে যায়, কখনো কখনো রাত্তিরেও থাকে। তার শরীর মোটামুটি সুস্থ, তবু তার ডাক্তার বলেছেন, মাঝে মাঝে তার উচিত কাজের কথা চিন্তা না করে কিছুটা সময় ফাঁকা কাটাতে। এতে মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকে।

স্বরূপচাঁদকে ছাড়া অবশ্য তার চলে না। স্বরূপচাঁদ সর্বক্ষণ তার সঙ্গে ছায়ার মতন ঘোরে। অরুণের সাহচর্যে থেকে স্বরূপচাঁদ নিজেও এখন যথেষ্ট ধনী, কিন্তু এখনো স্বরূপচাঁদ অরুণের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং ভৃত্যের কাজ করে। স্বরূপচাঁদ জানে, অরুণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টা করলে তার যথাসর্বস্ব আবার তলিয়ে যাবে।

সন্ধে হয়ে এসেছে নদীর ওপর প্রতিফলিত হয়েছে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটা। বারান্দায় একটা আরামকেদারায় শুয়ে আছে অরুণ,

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকার একটা পাতা ওল্টাচ্ছে অরুণ। এটাও ডাক্তারের নির্দেশ। তার বেড়াবার সময় নেই। বিলেত-আমেরিকাতে গেলেও সে কাজের লোকদের সঙ্গেই দেখা করে শুধু। একবার সুইজারল্যাণ্ডে এক সপ্তাহের ছুটি কাটাতে গিয়ে সে ছটফট করেছিল। নিজের হাতে গড়া ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে সে কিছুতেই ছুটি নিতে পারে না। সেইজন্যই ডাক্তার বলেছেন, আপনি তাহলে ভ্রমণকাহিনী পড়বেন কিংবা সুন্দর সুন্দর জায়গার ছবি দেখবেন।

একটু পরে স্বরূপচাঁদ একটি লোককে সঙ্গে নিয়ে এলো সেখানে।

মাঝবয়সী স্বরূপচাঁদের চেহারাটাও মাঝারি। ভিড়ের মধ্যে থাকলে চোখে পড়ে না। তার পোশাকও অতি সাধারণ প্যাণ্ট-শার্ট। কখনো সে গোঁফ রাখে, কখনো কামিয়ে ফেলে।

তার সঙ্গের লোকটির বেশ সুগঠিত চেহারা, লম্বাও কম নয়। বয়েসটা ঠিক বোঝা যায় না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, মুখ দেখলেও বোঝা যায় না বাঙালি না অন্য কোনো জাত। সে পরে আছে চুস্ত্ শেরোয়ানি, মাথায় চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে সান গ্লাস।

অরুণ এই আগন্তুককে প্রথমে আপাদ-মস্তক দেখলো। তারপর স্বরূপচাঁদকে বললো, বসবার জায়গা দাও।

স্বরূপচাঁদ ঘর থেকে নিয়ে এলো একটি মাত্র চেয়ার।

লোকটি তাতে বসে পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বার করে ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলো, আমি ধূমপান করলে আপনার আপত্তি নেই তো? আপনি একটা নেবেন?

অরুণ বলল, আমি খাই না। কিন্তু আপনি খেতে পারেন।

লোকটি সিগারেট ধরিয়ে বাইরের নদীর দিকে একবার তাকিয়ে বললো, বেশ জায়গা। আমার এরকম একটা জায়গায় থাকতে ইচ্ছে করে। এখানে একটা ঘর পাওয়া যাবে?

অরুণ বললো, আগে কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক। আপনি আর্মিতে ছিলেন?

লোকটি বললো, হ্যাঁ, ছিলাম। পাঁচ বছর আগে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছি।

অরুণ আবার জিজ্ঞেস করলো, এখন আপনি কী করছেন ?

লোকটি হেসে বললো, আমার ঠিকুজি-কুষ্ঠি, অতীত-বর্তমান সবকিছু লেখা কাগজপত্র আপনার কাছে আছে। আপনি সবই জানেন আমার সম্পর্কে। তবু আর একবার আমার মুখে সব কথা শুনতে চান, তাই না ?

অরুণ দু'বার মাথা নাড়লো।

লোকটি বললো, আমার নাম শঙ্কর রানা। আমাকে বাঙালিও বলতে পারেন, নেপালিও বলতে পারেন। আমার মা ছিলেন বাঙালি। আমি লেখাপড়া করেছি দার্জিলিং আর কোহিমায়। আমি বাংলা, অসমিয়া, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, ইংরিজি আর জার্মান ভাষা বেশ ভালো জানি, আরও তিন-চারটে ভাষায় মোটা-মুটি কথা বলতে পারি। আর্মি থেকে ইচ্ছে করেই অবসর নিয়েছি, ঐ জীবন ভালো লাগছিল না। কাঠমাণ্ডুতে আমাদের পৈতৃক একটা হোটেলের ব্যবসা আছে। আমি তার শেয়ার পাই। টাকা-পয়সার খুব একটার অভাব নেই। কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না। তাই আমি এখন এই কাজ নিয়েছি। ট্রাবল শুটার। আপনার মতন ধনী ব্যক্তিদের যখন কোনো খুব ব্যক্তিগত সমস্যা দেখা দেয়, তখন আমি সেটা সমাধান করার চেষ্টা করি। এ পর্যন্ত এক জায়গাতেও ব্যর্থ হইনি। আমার নিজের সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু আর নিজের মুখে বলতে চাই না।

অরুণ জিজ্ঞেস করলো, প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ এ পর্যন্ত আপনি কত জায়গায় করেছেন ? কোনো রেফারেন্স দিতে পারেন ?

শঙ্কর রানা বললো, প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, ট্রাবল শুটার। সব মিলিয়ে আমি পনেরো-ষোলোটা, কিন্তু কোনো ক্লায়েন্টের নাম আর একজনকে জানানো নিয়মবিরুদ্ধ।

অরুণ বললো, আপনি কী ধরনের ট্রাবল শুটার ? ধরুন, আমি যদি বলি, একটা লোক আমাকে খুব জ্বালাতন করছে, তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার, আপনি তাকে খুন করে আসতে পারবেন ?

শঙ্কর রানা ঠোঁটে সামান্য হাসির ঢেউ খেলিয়ে বললো, এটা

একটা অদ্ভুত প্রশ্ন। আপনার লোক আমাকে কি ভাড়াটে খুনী ভেবে এখানে নিয়ে এসেছে? ট্রাবল শুটার মানেই গুলি-গোলা চালানোর ব্যাপার নয়। নিছক আত্মরক্ষার কারণে ছাড়া আমি কারুর গায়ে হাত তুলি না। আমি সমস্যার সমাধান করি বুদ্ধি আর ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাকে বলে জানেন তো?

অরুণ সে প্রশ্নটা গ্রাহ্য না করে পাল্টা প্রশ্ন করলো, আপনার কাজের কোনো গ্যারাণ্টি আছে? ধরুন আপনাকে তো আমি কাজের জন্য ফি দিয়ে রাখবো? কিন্তু সে কাজটা যদি আপনি শেষ পর্যন্ত না পারেন তখন কী হবে?

শঙ্কর রানা বললো, আমি এ পর্যন্ত একবারও বিফল হইনি। প্রথমবার হেরে গেলেই এ কাজ ছেড়ে দেব। আপনার টাকা ফেরত দেবো অবশ্যই!

অরুণ বললো, ঠিক আছে। এবার কাজের কথা হোক। স্বরূপ তুমি কি একে কাজটা সম্পর্কে কিছু বলেছো?

স্বরূপ বললো, জী না। কিছু বলিনি।

অরুণ বললো, শুনুন রানাজী, কাল থেকে আগামী সাত দিন আপনার কাজ হবে শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা। বিকেল চারটে থেকে রাত ন'টা। গুরুসদয় রোডের একটা বাড়ির নম্বর আপনাকে দেবো, আপনি তার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু লক্ষ্য করবেন, সে বাড়ির মধ্যে কে যাচ্ছে, কে সেখান থেকে বেরুচ্ছে।

শঙ্কর রানা সঙ্গে সঙ্গে বললো, দুঃখিত, এ কাজ আমার দ্বারা হবে না।

অরুণ জিজ্ঞেস করলো, কেন আপনি পারবেন না?

স্বরূপ বললো, আপনি যে কাজই করুন, আপনাকে আপনার ফি দেওয়া হবে!

শঙ্কর রানা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, অযথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। যে কাজ পছন্দ হয় না, তা আমি করি না। দু'গুণ-তিন গুণ টাকা দিলেও কিছু যায় আসে না। যে কোনো পেটি ইনফরমার কিংবা ডিটেকটিভ এজেন্সির যে কোনো লোক ও কাজ করতে পারে। তার জন্য শঙ্কর রানার দরকার হয় না। গুড নাইট!

স্বরূপ বললো, আরে বসুন, বসুন। হঠাৎ উঠে পড়লেন কেন?

অরুণ তীক্ষ্ন চোখে লোকটিকে দেখলো।

শঙ্কর রানা বললো, আমার সত্যিই কোনো কাজ থাকে, তাহলে সেটা বলুন।

অরুণ এবার বললো, আমার সত্যিই একটা সমস্যা আছে। সেটা খুব জটিল সমস্যা। সেটা সমাধান করার জন্য কোনো ট্রাবল শুটারের দরকার না হবারই কথা। দরকার ভালো একজন ডাক্তারের পরামর্শ। কিন্তু আমি সাতজন খুব বড় ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁরা কিছুই বলতে পারেননি।

শঙ্কর রানা বললো, অন্য রোগের কথা আলাদা, তবে যদি মানসিক রোগ হয়, তাহলে আমি কিছুটা সাহায্য করতেও পারি। আমি মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনো করেছি। তাছাড়া ঐ যে বললাম, ষষ্ঠেন্দ্রিয়, তা দিয়ে আমি মানুষের ভেতরটা অনেকটা দেখে ফেলতে পারি। আপনি সমস্যাটা আমাকে বলতে পারেন।

অরুণ বললো, মনে করুন, একজন কেউ আমাকে ঘৃণা করে। অথচ তার ঘৃণা করার কোনো কারণই নেই। আমি তাকে খুব ভালোবাসি। খুবই ভালোবাসি। তবু সে আমাকে ঘৃণা করে কেন তা আমি জানতে চাই। সে মুখে কিছুতেই বলবে না। আপনি সেই কারণটা জেনে দিতে পারবেন?

শঙ্কর রানা ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর জিজ্ঞেস করলো, ঘৃণা করে মানে কী? সে আপনাকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়? আপনার মুখের ওপর দরজা বন্ধ দেয়? কিংবা চেচিয়ে গালি-গালাজ করে?

অরুণ বললো, না, না, সে রকম কিছু না। অনেক সময় সে খুব ভালো ব্যবহারই করে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ বদলে যায়। আমাকে দেখলে যেন দারুণ ভয় পায়। গালি দেয় না। চেঁচামেচি করে না। দু'হাতে মুখ ঢাকে। আর কথা বলে না।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, আপনার মেয়ে?

অরুণ চমকে প্রায় লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গি করে বললো, অ্যাঁ? তুমি…তুমি…আপনি কী করে জানলেন?

শঙ্কর রানা বললো, ষষ্ঠেন্দ্রিয় !

অরুণ হুঙ্কার দিয়ে বললো, স্বরূপ, তুমি এই লোকটাকে আমার বাড়ি নিয়ে গেছো ? আমার সম্পর্কে ওকে আগে কী বলেছো ?

স্বরূপ বললো, জী আপনার বাড়িতে ও কখনো যায়নি। এখানে আসবার সময় ওকে আপনার নামও বলিনি !

শঙ্কর রানা বললো, আমি আপনার বাড়ি কিংবা পরিবার সম্পর্কে কিছুই জানি না। আন্দাজ করলাম। মানুষ যখন নিজের প্রেমিকার কথা বলে আর যখন নিজের ছেলেমেয়ের কথা বলে, তখন গলার আওয়াজ একেবারে দু'রকম হয়ে যায়। আপনার কণ্ঠস্বর যেমন নরম হয়ে গেল, তাতেই মনে হলো যে আপনি ছেলে-মেয়ের কথাই বলছেন। মেয়ে হওয়াই বেশি সম্ভব !

অরুণ বললো, হ্যাঁ, আপনার খানিকটা ক্ষমতা আছে বুঝতে পারছি। তাহলে সব আপনাকে খুলেই বলি। তার আগে জানিয়ে রাখি, আমার গোপন কথা যদি আপনি বাইরে প্রচার করতে যান কিংবা আমার কোনো প্রতিযোগীর কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে তার ফল ভালো হবে না। আমার প্রতিশোধ অতি সাঙ্ঘাতিক।

শঙ্কর রানা মিটিমিটি হাসতে লাগলো।

অরুণ বললো, ভগবান আমাকে দুটি মাত্র সন্তান দিয়েছেন। এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে এখন লণ্ডনে পড়াশুনো করছে। মেয়েকে আমি লণ্ডন-আমেরিকা পাঠাতে চেয়েছি, কিন্তু সে যেতে চায় না। মেয়ে আমার ফুলের মতন পবিত্র। পড়া-লেখা ভালোবাসে। আমাকেও সে ভালোবাসে। কিন্তু এক এক সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন ভূত দেখার মতন ভয় পায়। ঘৃণায় তার মুখ কুঁকড়ে যায়। তখন আমার অসহ্য কষ্ট হয় !

শঙ্কর রানা জিজ্ঞেস করলো, কত বছর বয়েস থেকে আপনার মেয়ের এরকম ব্যবহার শুরু হয়েছে ?

অরুণ বললো, এই তো মাত্র দু'বছর ধরে। প্রথম যেবার হয়, আমার সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সেবারে আমরা দার্জিলিং ছিলাম, তাই না স্বরূপ ?

স্বরূপচাঁদ বললো, কালিম্পং। সেখানেই দু' নম্বর চা-বাগিচাটা কেনা হলো।

অরুণ বললো, হ্যাঁ, ঠিক। আমি হোল ফ্যামিলি নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার মেয়ে রুমা খুব পছন্দ করেছিল জায়গাটা। চা-বাগানের মধ্যে একটা খুব বড় বাংলো আছে। রুমা বাগানে বসে বই পড়তো। একদিন আমি ওর জন্য একটা খুব সুন্দর কলম কিনে আনলাম। পুরানা জমানার ওয়াটারম্যান ফাউণ্টেন পেন, গোল্ড ক্যাপ, কোনো সাহেবের ছিল। আমি আদর করে ওকে কলমটা দিতে গেছি, রুমা হঠাৎ চোখ বড় বড় করে আঁ আঁ শব্দ করে উঠলো। যেন খুব ভয় পেয়েছে। যেন চোখের সামনে কোনো দুশমন কিংবা শয়তানকে দেখেছে। আমি যত বলি, রুমা বেটী, কী হয়েছে? এই তো আমি, তোর বাবা, সে তত বেশ ভয় পায় আর ঘেন্না করে, পিছু হঠতে হঠতে সে হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল!

স্বরূপচাঁদ বললো, তখনই ডাক্তার আনা হলো ডাক্তারের ওষুধে জ্ঞান ফিরে এলো। সব আবার ঠিকঠাক। কিন্তু আগের কথা তার মনে নেই।

শঙ্কর রানা জিজ্ঞেস করলো, মেয়ের জন্য কলমটা কোথা থেকে কিনলেন?

অরুণ বললো, বাজার থেকে। একটা অ্যান্টিক শপ আছে, সেখানে খুব দামি দামি জিনিস রাখে।

শঙ্কর রানা আবার জিজ্ঞেস করলো, কলমটা কেনার পর, মেয়েকে দেবার আগে, তা দিয়ে আপনি নিজে কিছু লিখেছিলেন?

অরুণ বললো, না তো! আমি আবার নিজে কী লিখবো?

শঙ্কর রানা তবু বললো, ভালো করে ভেবে দেখুন!

অরুণ জোর দিয়ে বললো, আমার কোম্পানির লেখালেখির কাজ অন্য লোক করে। আমার কলম দিয়ে কিছু লেখার দরকার হয় না!

শঙ্কর রানা বললো, চেকে সইও করেন না আপনি?

স্বরূপচাঁদ বললো, স্যার, এটা হতে পারে কি, আপনি ঐ কলম

দিয়ে চা-বাগিচা খরিদের কন্ট্রাক্ট-এ সই করেছিলেন। সেইদিনই ফাইনাল এগ্রিমেন্ট হলো।

অরুণ বললেন, সেই দিনই, না? ঐ কলমেই সই করেছি?

শঙ্কর রানা খানিকটা স্বগতোক্তির স্বরে বললো, কালিম্পং-এর দু'নম্বর চা-বাগান, তার মানে রূপাই টি গার্ডেনস। ওর মালিকের বউ আত্মহত্যা করেছিল।

অরুণ বললো, মাই গড!

শঙ্কর রানা বললো, খবরটা কাগজে পড়েছিলাম।

স্বরূপচাঁদ বললো, আগের মালিকের বউ আত্মহত্যা করেছিল বটে, কিন্তু সে তো আমাদের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট হয়ে যাবার এক মাস পরে। সে বউ থাকতো বেনারসে। অন্য কোনো কারণ ছিল।

শঙ্কর রানা বললো, হুঁ!

অরুণ বললো, তুমি…আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি!

শঙ্কর রানা বললো, মনে করুন, আপনার সঙ্গে রাজীব গান্ধীর নতুন আলাপ হয়েছে। আপনি কি তাকে বারবার তুমি বলে ফেলবেন? নেপালে আমাদের ফ্যামিলিও খুব সম্মানিত। আমাকে প্রথম আলাপেই কেউ তুমি বলে না। অবশ্য, আপনি আমাকে যদি তুমি বলে ডাকতে চান, তাতে আমার আপত্তি নেই, তাহলে আপনাকেও আমি সম্বোধন করবো তুমি বলে।

অরুণ বললো, আই অ্যাম সরি! আই অ্যাম সরি!

শঙ্কর রানা বললো, খবরের কাগজে যত খবর পড়ি, তার অধিকাংশই আমার মনে থেকে যায়।

অরুণ বললো, আপনার মেমারি ভালো। আপনি আমার মেয়ের সব খবর নিতে পারবেন? বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে কখন কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেশে, এসব খবর জানতে হবে। তারপর বোঝার চেষ্টা করতে হবে, সে আমার সম্পর্কে কী ভাবে! অন্যদের কাছে আমার সম্পর্কে কী বলে! পারবেন?

শঙ্কর রানা বললো, এ কাজটা হাতে নেওয়া যেতে পারে।

অরুণ বললো, আপনার যা ফি সব দেবো। দশ দিন পর আমাকে প্রথম রিপোর্ট দেবেন। তবে একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমার মেয়ে খুব সরল। তার মুখ যেমন সুন্দর, মনটাও সে রকম সুন্দর। আপনি বিয়ে করেননি। আপনি যদি আমার মেয়ের সঙ্গে অন্যরকম ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন, তবে আপনার মাংস আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। আপনাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবো. সে আপনি নেপালের যত বড় বংশের সন্তানই হোন না কেন!

শঙ্কর রানা বললো, কাজটা খুব সহজ হবে না।

অরুণ বললো, হ্যাঁ, ঠিক, আমার মেয়ে রুমা সহজে মুখ খুলতেই চায় না। অচেনা লোকের সঙ্গে কথাই বলে না। সুতরাং আপনার কাজটা সহজ হবে না।

শঙ্কর রানা চওড়া করে হেসে বললো, আমি সেকথা বলিনি। বললাম যে, আপনি চাইলেই আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া মোটেই সহজ কাজ হবে না। আমার নাম শঙ্কর রানা, আমি ম্যাজিক জানি! পাঁচজন লোক মিলে একসঙ্গে আমাকে মারবার চেষ্টা করলেও আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি!

অরুণ বললো, তাই বুঝি? এই ঘর থেকে কী করে অদৃশ্য হতে পারেন, একবার দেখান তো।

শঙ্কর রানা বললো, বিনা প্রয়োজনে ওসব দেখাতে নেই। তাতে গুণ নষ্ট হয়ে যায়। আমি আমার আর একটা শক্তির প্রমাণ দিচ্ছি। আপনার একটা গোপন ব্যাপার ফাঁস করে দেবো?

অরুণ বললো, সেটাই দেখা যাক।

শঙ্কর রানা বললো, আমি এ ঘরের মধ্যে জীবনে কখনো আসিনি। তবু আমি বলে দিতে পারি, এ ঘরের মেঝেতে একটা সিন্দুক পোঁতা আছে। আর সেটা আছে. আপনি যে চেয়ারটায় বসে আছেন, ঠিক তার নিচে!

অরুণ এবার বিস্ময়ে কোনো কথাই বলতে পারলো না।

শঙ্কর রানা বললো, আপনি যে চটি থেকে পা বার করে মাঝে মাঝে মাটিতে ঘষছেন, সেটা ঠিক হচ্ছে না। মেঝেতে যে একটা

চৌকো দাগ আছে, আপনি সেটার ওপরেই শুধু অন্যমনস্কভাবে পা ঘষছেন। যে কোনো বুদ্ধিমান লোক ওটা দেখেই বুঝে ফেলবে।

অরুণ এবার অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, স্বরূপচাঁদ, তুই তো ঠিক লোককেই এনেছিস রে! এই রকম একটা লোককে আমি পরে আরো অনেক কাজে লাগাবো। বুদ্ধিমান লোক তো আজকাল দেখতেই পাই না।

শঙ্কর রানা বললো, কেন, আয়নাতেও দেখতে পান না?

দু'জনেই এবার হেসে উঠলো হো-হো-হো করে।

একটু পরে শঙ্কর রানা বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই অরুণ বললো, আপনি আর একটু বসুন না। আমাদের সঙ্গেই ডিনার খেয়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

শঙ্কর রানা বললো, ধনী ব্যক্তিদের কাছে কাছে সব সময় একদল মোসাহেব কিংবা যে-হুজুরের দল থাকে। ধনী ব্যক্তিরা এদের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পান। আমাকে সেরকম মোসাহেবের ভূমিকায় ঠিক মানাবে না।

অরুণ বললো, এটা আপনার ভুল হলো, রানাজী। আজকাল-কার ধনীরা সেরকম মোসাহেব রাখে না। যারা মুখের ওপর সত্যি কথা বলে, আমার কোনো ভুল দেখলে তা নিয়ে ঠাট্টা করতে ছাড়ে না, সেরকম মানুষদেরই আমার পছন্দ।

শঙ্কর রানা টপ করে জিজ্ঞেস করলো, কী হিসেবে?

অরুণ ঠিক বুঝতে না পেরে বললো, তার মানে?

শঙ্কর রানা বললো, আমাকে যে আপনার পছন্দ হয়েছে, তা কী হিসেবে? আপনার একজন কর্মচারি হিসেবে, না সমান সমান একজন মানুষ হিসেবে?

অরুণ বললো, আপনাকে আমার সমান সমান মনে করবো কেন এক্ষুণি? আমি নিজের চেষ্টায় এতগুলো বিজনেস-এর মালিক হয়েছি, আর আপনি পরের হয়ে ট্রাবল শুটারের কাজ করে বেড়াচ্ছেন। আপনি আর আমি এক হবো কী করে?

শঙ্কর রানা বললো, আপনি টাকা-পয়সা কিংবা কাজের গুরুত্ব

অনুযায়ী মানুষকে বিচার করেন। এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। আমার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য অন্য। কাঠমাণ্ডু থেকে মাইল চল্লিশক দূরে ধুলিখেল বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে আমি একজন সাধারণ কাঠুরিয়াকে দেখেছি, বুদ্ধিতে কিংবা হৃদয়বৃত্তিতে সে আপনার কিংবা আমার চেয়ে অনেক বড়। আমি কখনো তার সমান সমান হতে পারলে ধন্য বোধ করবো। আমি ট্রাবল শুটারের কাজটা কেন নিয়েছি জানেন? টাকা-পয়সা জন্য নয়। যে-কাজ অন্যরা পারে না, কিন্তু আমি পারি, সেই ব্যাপারটায় গর্ব অনুভব করার জন্য।

অরুণ বললো, আপনার দেখছি আত্মবিশ্বাস বড্ড বেশি!

শংকর রানা বললো, কম হতে যাবে কেন? একটু বেশি থাকাই বরং ভালো।

অরুণ বললো, ঠিক আছে তা হলে কাল থেকেই কাজ শুরু করুন। দশ দিন পরে রিপোর্ট চাই। আমার কাছ থেকে আপনার আর কিছু জানার নেই তো?

শংকর রানা বললো, একটা ছোট্ট ব্যাপার। আপনি বললেন, কয়েক দিন আগে, লাস্ট যখন আপনার মেয়ে আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে, সেই সময় সে একটা বই পড়ছিল। কী বই ছিল সেটা?

অরুণ বললো, তা আমি জানবো কী করে? বইটা তো সে আমায় দেখতে দেয়নি। আমি কাছে আসতেই সে বইটা বারান্দা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

শংকর রানা বললো, ছুঁড়ে ফেলে দিলেও সেটা মাটিতে গিয়েই পড়েছে। কোনো লোক দিয়ে বইটা আনিয়ে নেওয়া যেত। বইটা কী ছিল, তা দেখার জন্য আপানার কৌতূহল হয়নি?

অরুণ বললো, আপনি কি ভাবছেন, সেটা কোনো খারাপ, অশ্লীল বই? তা হতেই পারে না! আমার মেয়ে রুমা কোনো নোংরা বই ছোঁবেও না কক্ষণো।

শংকর রানা বললো, আমি সে কথা ভাবিনি। আমি কোনো বইকেই অশ্লীল মনে করি না। এমনও তো হতে পারে, আপনার মেয়ে রুমা মনে করেছিল, সেই বইটা আপনি ছুঁলেই নোংরা হয়ে

যাবে! সেইজন্যই সেই বইটা কি একবার আপনার দেখা উচিত ছিল না?

অরুণ বললো, না। আমি সে কথা ভাবিনি। আমার অত কৌতূহল কিংবা আগ্রহ নেই।

শঙ্কর রানা বললো, ছেলেমেয়েদের রুচি সম্পর্কে বাবা-মায়েদের কিছুটা কৌতূহল আর আগ্রহ থাকাই তো স্বাভাবিক। আপনার যদি তা থাকতো, তাহলে আর ট্রাবল শুটার ডাকতে হতো না। আপনি নিজেই আপনার ও আপনার মেয়ের সমস্যার সমাধান করতে পারতেন!

॥ তিন ॥

এরপর এক বছর কেটে গেছে।

রুমাকে বিয়ে করার পর শঙ্কর রানা তাকে নিয়ে হনিমুন করতে গিয়েছিল আফ্রিকায়। ফিরে এসেছে মাত্র দেড় মাস আগে। আপাতত ওরা উঠেছে নেপালের একটা ছোট্ট পাহাড় ঘেরা গ্রামের বাড়িতে। এই বাড়িটাও শঙ্কর রানাদের পারিবারিক সম্পত্তি। এ ছাড়া শঙ্কর রানার একটা ফ্ল্যাট আছে কলকাতার প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে, আর একটা ফ্ল্যাট বোম্বাইয়ের মালাবার হিল্স-এ।

রুমার এই গ্রামের বাড়িটাই পছন্দ। বেশি শীত পড়লে অবশ্য সে কলকাতা আর বোম্বেতে পালা করে থাকবে।

যদিও খুব ছোট্ট গ্রাম, তবু এখান দিয়ে অনেক টুরিস্ট যায়। দেশী, বিদেশী, নানারকম। গ্রামের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, সেটা দিয়েই তিব্বতে পৌঁছোনো যায়।

বাগানে দুটো বেতের চেয়ারে বসে আছে শঙ্কর রানা আর রুমা। আকাশে ঝকঝক করছে রোদ। বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডা ভাব। রুমা পড়ছে গতকালের খবরের কাগজ, আর শঙ্কর রানা একটা টেবল ক্লকের সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে সারাবার চেষ্টা করছে।

একসময় একটা শব্দ শুনে শঙ্কর রানা মুখ তুলে তাকালো,

বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ দীর্ঘকায় মানুষ, সে শঙ্কর রানাকে দেখে বলে উঠলো, এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি···

বাড়িতে ভেতরে থেকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এসে লোকটিকে তেড়ে গেল।

শঙ্কর রানা শিস দিয়ে কুকুরটাকে সংযত করে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, ইয়েস? হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

দীর্ঘকায় লোকটি বললো, মাপ করবেন, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে বিরক্ত করছি। আপনার বাড়িতে কি টেলিফোন আছে?

শঙ্কর রানা বললো, এ বাড়িতে অনেক সময়ই মানুষ-জন থাকে না। একটা টেলিফোন আছে বটে, কিন্তু সাড়াশব্দ করে না।

লোকটি বললো, মুশকিল হলো। বিপদে পড়ে গেছি। এখানে কাছাকাছি আর কোথায় ফোন পাওয়া যেতে পারে, বলতে পারেন?

শঙ্কর রানা বললো, এখানে টেলিফোন কি আর আছে কাছাকাছি? আপনার কী প্রয়োজন বলুন তো!

লোকটি বললো, আমরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছি গোটা নেপাল ঘুরে দেখার জন্য। মাইল খানেক আগের রাস্তায় গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে। কী যে হয়েছে বুঝতেই পারছি না। কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। টেলিফোন করে কাঠমাণ্ডু থেকে মেকানিক না আনালে বোধহয় গাড়িটা আর নড়ানো যাবে না। গাড়িতে আমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রয়েছে। এর পর সন্ধে হয়ে গেলে রাস্তায় তো আর থাকা যাবে না!

শঙ্কর রানা ট্রাবল শুটার। কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তাকে সাহায্য করাই তার স্বভাব। সেই অভ্যেসটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সে বললো, চলুন তো দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না!

লোকটি খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বললো, আপনি···আপনি কি গাড়ির কাজ জানেন? আপনি মেকানিক?

শঙ্কর রানা বললো, না। মেকানিক নই, তবে কিছু কিছু কাজ জানি। চেষ্টা করে দেখতে পারি।

শঙ্কর রানার পরনে একটা দামি ড্রেসিং গাউন। একটু দূরে বসে আছে তার সুন্দরী স্ত্রী। বাড়িটাও প্রাসাদের মতন। সেসব দিকে তাকিয়ে সেই লোকটি সংকুচিতভাবে বললো, গাড়িটা রয়েছে প্রায় দেড় মাইল দূরে। আমি টেলিফোন খুঁজতে খুঁজতে এতটা এসেছি। আপনি কষ্ট করে অতখানি পথ যাবেন?

শঙ্কর রানা হেসে উঠে বললো, দেড় মাইল আর এমন কি দূর। চলুন, চলুন! রুমা, আমি একটু ঘুরে আসছি!

লোকটি খুশি হবার বদলে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে শঙ্কর রানার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আশ্চর্য, আশ্চর্য, আর একজন লোকের সঙ্গে আপনার চেহারা ও গলার আওয়াজের অদ্ভুত মিল! তার নাম শঙ্কর জানা!

শঙ্কর রানা বললো, আমিই সেই ব্যক্তি। আমার আসল পদবী রানা, পশ্চিম বাংলায় গেলে কখনো কখনো জানা হয়ে যাই।

লম্বা লোকটি ওর হাত চেপে ধরে প্রবল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললো, শঙ্কর জানা? সত্যিই তো। সেই একই মানুষ! আমায় চিনতে পারছেন না? আমার নাম গোলাম নবী, আমি মেদিনীপুরের ডি এস পি ছিলাম এক সময়!

শঙ্কর রানা অবিশ্বাসের সুরে বললো, গোলাম নবী? হ্যাঁ, আমি মেদিনীপুরের ডি এস পি এক গোলাম নবীকে চিনি ঠিকই। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের মাথায় ছিল টাক। আর দাড়ি-গোঁফ কামানো। কিন্তু আপনার দেখছি মাথাভর্তি চুল, মুখে অল্প দাড়ি। তা দাড়ি রাখলেও টাক মাথায় চুল গজালো কী করে? আমি মানুষের চেহারা ভুলি না। ও, ও, বুঝেছি, বুঝেছি।

গোলাম নবী বললো, এবার ঠিক ধরেছেন। আমি উইগ মানে পরচুলা পরেছি। বিয়ে করার পর আমার স্ত্রীর কথায় মাথায় এসব লাগাতে হয়েছে। আমার স্ত্রী টাক দেখতে পারে না দু'চক্ষে। আপনিই তা হলে শঙ্কর জানা, মানে শঙ্কর রানা? আপনি নেপালি? তখন ভেবেছিলাম, আপনি বাঙালি! কেমন দেখা হয়ে গেল!

শঙ্কর রানা বললো, আসুন, আসুন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে

আলাপ করিয়ে দিই। রুমা, ইনি গোলাম নবী, একজন পুলিশ অফিসার। একসময় মেদিনীপুরে আমায় অনেক সাহায্য করে-ছিলেন। এখন এঁরা খানিকটা অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। এখন আমাদের উচিত এঁকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সহ আজ রাতটার মতন আমাদের বাড়িতে আটকে রাখা, তাই না? গাড়িটা সারাবার ব্যবস্থা করছি।

গোলাম নবী রুমার দিকে চেয়ে বললেন, ইনিই তাহলে সেই নাবালিকা?

শংকর রানা বললো, হ্যাঁ, ইনি চিরকাল নাবালিকাই থেকে যাবেন। জানো রুমা, এই গোলাম নবী সাহেব আমাকে ধরতে এসে-ছিলেন নাবালিকা অপহরণের অভিযোগে। একেবারে রিভলভার টিভলভার উঁচিয়ে।

গোলাম নবী বললো, আর মনে করিয়ে দেবেন না সেসব লজ্জার কথা। আপনারা এখন এখানে থাকছেন?

শংকর রানা বললো, সেসব গল্প পরে হবে। আগে চলুন, আপনার স্ত্রী-ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আসি। সন্ধ্যে হতে বেশি দেরি নেই।

গোলাম নবী বাগানের গেট থেকে বেরিয়েই বললো, শংকরবাবু, আপনার সঙ্গে এভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায় কী যে আনন্দ হচ্ছে, তা বলে বোঝাতে পারবো না। আপনার কাছে আমি দারুণভাবে ঋণী। সে ঋণ কীভাবে শোধ দেবো তা জানি না।

শংকর রানা বললো, সে কি মশাই, আপনি আবার আমার কাছে ঋণ করলেন কবে? আমিই বরং আপনার কাছে উপকৃত!

গোলাম নবী বললো, আরো না, না! উপকার হয়েছে আমার। সেই যে সেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হলো, তারপর থেকে আমার জীবনটাই ঘুরে গেল। আপনি মেদিনীপুর শহরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাংলোতে ছিলেন, আমি গেলাম আপনাকে অ্যারেস্ট করতে। তার-পর আপনার সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলার পর বেরিয়ে এসে আমার মনের একটা কী যে পরিবর্তন হলো, পুলিশ লাইনের ওপরেই অভক্তি আর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। এক মাসের মধ্যে চাকরি ছেড়ে

দিলাম। এখন আমি স্বাধীন ব্যবসা করি। বেশ ভালো আছি।

শংকর রানা বললো, চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন? বাঃ! আমিও ওসব কাজ আর করি না। যথেষ্ট হয়েছে!

গোলাম নবী বললো, আপনি ছাড়তে পারবেন না! আ ট্রাবল শুটার ইজ অলওয়েজ আ ট্রাবল শুটার। আমার পরিচয় না জেনেই তো আপনি আমার গাড়ি ঠিক করতে যাচ্ছিলেন।

গাড়িটা অবশ্য ঠিক হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। শংকর রানা গাড়ির কাজ ভালোই জানে। গোলাম নবী রাত্তিরের মধ্যেই সপরিবারে কাঠমাণ্ডু ফিরে যাবে ঠিক করলো, তবু শংকর রানা তাদের জোর করে বাড়িতে নিয়ে এলো চা-জলখাবার খাওয়াতে।

বারান্দায় বসে অনেক পুরোনো গল্প হলো।

গোলাম নবী রুমাকে বললো, জানেন, রুমা দেবী, আপনার স্বামীর মতন এমন আসামী আমি জীবনে আর দেখিনি। গেলাম ওকে অ্যারেস্ট করতে। কলকাতা থেকে বড় বড় পলিটিক্যাল লিডাররা ফোন করেছিল, যেভাবে হোক শংকর জানা কিংবা রানাকে ধরতেই হবে। সে একজন নটোরিয়াস ক্রিমিনাল, অল্পবয়সী মেয়েদের ফুসলোনোই তার কাজ। সঙ্গে আবার বন্দুক-পিস্তল থাকে। ওমা, গিয়ে দেখি, হাসি মুখে একজন সুদর্শন পুরুষ বসে আছে। আমাকে দেখে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, বাঁধতে চান, বাঁধুন। তার আগে শুধু আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

শংকর হাসতে হাসতে বললো, থাক থাক, ওসব কথা এখন থাক।

গোলাম নবী বললো, সত্যি বলছি, সেদিন থেকেই আমার জীবনটা বদলে গেছে। চাকরির ওপর ঘেন্না ধরে গেল!

রুমা বললো, আমার বাবা আমাদের বিয়ে বন্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি গুণ্ডা লাগিয়ে ওকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছিলেন!

শংকর বললো, বৃথা চেষ্টা। তোমার বাবাকে আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমাকে মেরে ফেলা সহজ নয়। আমি ম্যাজিক জানি!

গোলাম নবী বললো, গুণ্ডাদের হাত এড়ানো যায়। কিন্তু আপনার বাবা একজন বড় ব্যবসায়ী, তাই তিনি পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। বড় বড় নেতা কিংবা মন্ত্রীরাও এই সব ব্যবসায়ীদের কথায় ওঠে-বসে, তারা টেলিফোনে হুকুম দিলে পুলিশ তা মানতে বাধ্য! থানায় নিয়ে গিয়ে আপনার স্বামীকে পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়া হতো। একেবারে মেরে ফেলাও বিচিত্র কিছু নয়।

তারপর শংকরের দিকে ফিরে গোলাম নবী বললো, আপনি সত্যি ম্যাজিক জানেন। শুধু কথা দিয়ে আমার মতন একজন ঝানু পুলিশ অফিসারকে আপনি আধঘণ্টার মধ্যে আপনার ভক্ত করে ফেললেন?

শংকর বললো, পুলিশরাও তো মানুষ! অনেকে ভাবে, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াই পুলিশের কাজ। কিন্তু নিরাপরাধদের সাহায্য করাও যে পুলিশের একটা বড় দায়িত্ব, সেটা অনেকে মনে রাখে না। আমি শুধু আপনাকে সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। নবী সাহেব, এখন আপনি কী করছেন?

গোলাম নবী বললো, এখন আমি ব্যবসা করি। ছোটখাটো ওষুধের ব্যবসা। একটু লাভ হলেই পাহাড়ে বেড়াতে যাই। আমি দেখেছি, উঁচুতে উঠলে মন ভালো হয়ে যায়!

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর গোলাম নবী বিদায় নিল।

রুমা শংকরকে বললো, ভদ্রলোক সত্যি তোমার খুব ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তুমি যদি কোনো গুরুঠাকুর হতে, তাহলে তুমি অনেক শিষ্য জুটিয়ে ফেলতে পারতে!

শংকর হেসে বললো, শুধু তোমার বাবাকেই কিছু করতে পারলাম না। অনেক চেষ্টা করেছিলাম।

রুমা বললো, আমার বাবা কাঠমাণ্ডুতে এসেছেন!

শংকর চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি? তুমি কী করে জানলে?

রুমা মাটি থেকে তুলে নিল খবরের কাগজটা। প্রথম পৃষ্ঠার তলার দিকেই রয়েছে একটা গ্রুপ ছবি। নেপালে একটা কোল্ড ড্রিংকসের কারখানা হচ্ছে যৌথ উদ্যোগে, অরুণ বাজোরিয়া এসেছে

সেই ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করতে।

কাগজটা দেখে শঙ্কর বললো, সত্যিই তো। এখানে লিখেছে যে উনি সামনের তিন তারিখ পর্যন্ত নেপালে থাকবেন। তোমার মা-ও সঙ্গে এসেছেন কি না কে জানে!

রুমা বললো, মা বেড়াতে ভালোবাসে না। বাবা বিজনেসের কাজে বাইরে গেলে মা সাধারণত সঙ্গে যায় না।

শঙ্কর দুষ্টুমির সুরে বললো, তোমার বাবাকে একদিন এ বাড়িতে নেমন্তন্ন করবো নাকি?

রুমা আতঙ্কিত হয়ে বললো, না, না, খবরদার না! আমি আমার বাবাকে চিনি। উনি আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। আমরা এখানে আছি টের পেয়ে গেলে, উনি আবার তোমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করবেন। আমি বিধবা হলেও বাবা খুশি হবেন!

শঙ্কর বললো, আরে, তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন? নেপালে বসে উনি আমাদের কী ক্ষতি করবেন? আমাদের পক্ষ থেকে একবার নেমন্তন্ন জানানো উচিত নয়?

—কোনো দরকার নেই!

—রুমা, সত্যি করে বলো তো, তোমার কি মা-বাবাকে দেখার ইচ্ছে হয় না?

—না, হয় না। আমি লেখাপড়া শিখেছি, পুরোপুরি অ্যাডাল্ট, তবু আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের কোনো মূল্য কি ওঁরা দিয়েছেন? আমার যাকে পছন্দ, তাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না?

—অধিকাংশ বাবা-মা এখনো এই ধরনের বিয়ে মেনে নিতে পারে না। ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাধারণত বিয়ে হয় অন্য একটা ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। তাতে দুটি ব্যবসা জোরদার হয়। তোমার বাবা-মাও নিশ্চয়ই তোমার জন্য সে রকম একটা সুপাত্র বেছে রেখেছিলেন। তার বদলে তুমি পছন্দ করলে এক বাউণ্ডুলেকে, সে আবার নেপালি, তার কাজ-কর্মের কোনো ঠিক নেই।

—তোমাদেরও তো ব্যবসা আছে। এই যে বাবা কাঠমাণ্ডুতে

নতুন কারখানা বসাতে এসেছেন, তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে যোগা-যোগ করেও তো সেরকম একটা কিছু করতে পারতেন!

—আমার নিজের যে ব্যবসা-ট্যাবসার দিকে মন নেই। যাই বলো, আমার একবার ইচ্ছে আছে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করার।

—না, প্লিজ, ওসব করতে যেও না। আমার ভয় করে!

—তোমার বাবাকে কি তুমি আগেও খুব ভয় পেতে? তোমার সেই যে অসুখটা, তুমি তোমার বাবাকে দেখে এক এক সময় আঁতকে উঠে মুখ ঢাকতে, আঁ আঁ শব্দ করতে, কখনো কখনো অজ্ঞান হয়ে যেতে, সেই অসুখটা একেবারে সেরে গেছে কি না বোঝা গেল না।

—আমার কোনো অসুখ নেই।

—তুমি প্রত্যেকদিন একটা সদ্য ফোটা ফুলের মতন ফুটফুটে, তা আমি জানি, রুমা! আর কোনো মানুষকে দেখলে তোমার অমন হয় না। শুধু অরুণ বাজোরিয়াকে দেখলেই, এই সুন্দর ফুলটার ওপর একটা কালো ছায়া পড়তো!

—তুমি তো কাজ করেছো মিলিটারিতে, এত সব কবিত্ব শিখলে কোথায়?

—যারা যুদ্ধ করে, তারা বুঝি কবিতাটবিতা পড়ে না ভেবেছো?

রুমা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মাথায় হিম পড়ছে, চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, তখন থেকে ভাবছি, কী যেন একটা তোমাকে জানানো উচিত, কী যেন একটা কথা। অথচ ঠিক মনে পড়ছিল না। এইমাত্র মনে পড়লো। এই গোলাম নবী সাহেব আজ হঠাৎ এসে পড়লেন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা হলো। কিন্তু জানো, আমার মনে হচ্ছে, উনি হঠাৎ গাড়ি খারাপ হবার পর এখানে আসেননি। উনি তোমাকে খুঁজতেই এখানে এসেছিলেন।

শঙ্কর প্রবল অবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, যাঃ তা কী করে হবে? সত্যি ওঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া উনি জানবেন কী করে যে আমরা এই সময় এখানে থাকবো?

রুমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, সেটা জানা কি খুব শক্ত? কাঠমাণ্ডুতে তোমাদের হোটেলে গিয়ে খোঁজ করলেই বলে দেবে, তুমি কোথায় আছো। তুমি তো জানাতে বারণ করোনি।

—তা ঠিক। কিন্তু গোলাম নবী সাহেব আমার খোঁজ করতে এলে, সে কথা বলবেন না কেন?

—তা আমি জানি না।

—তুমি কী করে বুঝলে যে উনি জেনেশুনেই এসেছেন?

—এক একজনের মুখ দেখলেই আমি তার সম্পর্কে কিছু কিছু ব্যাপার বুঝে যাই!

—তুমি আমার মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারো, রুমা?

—হ্যাঁ। তোমাকে যখন প্রথম দেখি, গুরুসদয় রোডে একটা গাড়ি খুব জোরে ব্রেক কষলো আমার সামনে। আর একটু হলে চাপা পড়তাম, তুমি নেমে এলে সেই গাড়ি থেকে। তখন তোমাকে দেখে আমার তো খুব রাগ হবার কথা ছিল, তাই না? তুমি আমাকে চাপা দিচ্ছিলে প্রায়। কিন্তু তোমার দিকে প্রথম তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, এই লোকটি আমার বন্ধু হবে।

—সত্যি? এ কথা আগে বলোনি তো কখনো?

—সব কথা কি আর সব সময় বলা যায়! একটা বিশেষ সময় লাগে!

রুমার কথাই সত্যি হলো, পরের দিন সকালে আবার এসে উপস্থিত হলো গোলাম নবী। এবার একা। কোনো রকম ভণিতা না করেই বললো, রানাসাহেব, আপনার কাছে আমি একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। আপনাকে আমি খুঁজছিলাম।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি জানতেন যে আমি এখানে থাকবো?

গোলাম নবী বললো, খানিকটা আন্দাজ পেয়েছিলাম যে আপনি এদিকেই কোথাও আছেন। কিন্তু কাল আপনাকে কিছু বলিনি, আমার লজ্জা করছিল। কাল যখন দেখলাম আপনি আর আপনার স্ত্রী বাগানে বসে আছেন, তখন মনে হলো, আপনারা অনেক ঝড়-ঝাপটা সামলে বিয়ে করেছেন, এখানে দু'জনে মিলে মধুযামিনী

যাপন করছেন, এর মধ্যে কোনো কাজের কথা বলা উচিত নয়। সেটা আমার স্বার্থপরতা। কিন্তু আমি একটা বেশ মুশকিলে পড়ে গেছি!

—আমাদের মধুযামিনী হয়ে গেছে আফ্রিকায়। হাতির পিঠে চেপে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছি। এখানে এসেছি দু'চার দিনের জন্য। আমি কাজ ছাড়া বাঁচতে পারি না। নতুন কী কাজ শুরু করবো তাই ভাবছিলাম। আপনার আবার কী মুশকিল হলো?

—মুশকিল মানে, বেশ বিপদে পড়ে গেছি। আপনার কাছে একটু পরামর্শ চাই। দিশেহারা অবস্থায় প্রথমে আপনার নামটাই মনে পড়েছিল। তাই কাঠমাণ্ডুতে রানা অ্যাণ্ড রানা হোটেলে আপনার খোঁজ করেছিলাম। আমরা ওই হোটেলেই উঠেছি।

শঙ্কর অদূরে বসে থাকা রুমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো।

গোলাম নবী বললো, আপনি বলবীর বাহাদুরের নাম শুনেছেন?

শঙ্কর ভুরু কুঁচকে বললো, বলবীর বাহাদুর···এই নামে দু'জনকে চিনি, একজন কলেজে পড়ায়, আর একজন আছে ব্যবসায়ী, নানা রকম জিনিসের ব্যবসা করে, পাহাড়ে চড়ার সরঞ্জাম, ওষুধ, বিয়ার এইসব আর কী কী যেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ব্যবসায়ী বলবীর বাহাদুরের কথাই বলছি।

—সে কী করেছে আপনার?

—আমার সঙ্গে তার ব্যবসার সম্পর্ক ছিল, কলকাতায় যায় প্রায়ই, আমার কাছ থেকে এক লাখ-দেড় লাখ টাকার ওষুধ ক্যাশ টাকা দিয়ে কিনে আনে। খুব ভালো ব্যবসা চলছিল ওর সঙ্গে। গত ছ'মাসে ও আমার সঙ্গে বহু টাকার ব্যবসা করেছে। সব সময় পেমেন্ট ছিল ঠিকঠাক। কোনো কমপ্লেন ছিল না। গত সপ্তাহে ও শনিবার দিন আমার কাছ থেকে এক লাখ বারো হাজার টাকার ওষুধের ডেলিভারি চাইলো। সেদিনই ওকে কাঠমাণ্ডু ফিরতে হবে। কিন্তু ব্যাংকে যেতে দেরি করেছে বলে টাকা তুলতে পারেনি। আমাকে চেক দিতে চেয়েছিল। আমি তখন বললাম, আমি তো

শিগগিরই নেপাল যাচ্ছি, টাকাটা আমাকে সেখানে দিয়ে দেবে। তাতে আমারও সুবিধে হবে।

—টাকাটা ও এখন দিতে পারছে না?

—তাও নয়। ও যদি বলতো, টাকাটা এখন দিতে পারছে না, ওর কোনো অসুবিধে আছে, কিছুদিন পরে দেবে, তাতেও দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। আমি একেবারে খালি হাতে তো আসিনি! কিন্তু বলবীর বাহাদুর আমার সঙ্গে দেখা করতেই চাইছে না। ফোন ধরছে না। আমি তিন দিন চেষ্টা করেছি। কাল ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে জানিয়ে দিল যে, ও গোলাম নবী নামে কারুকে চেনে না। আমার কোম্পানির সঙ্গে ও কোনো-দিন ব্যবসা করেনি, গত এক মাসের মধ্যে ও কলকাতা থেকে কোনো ওষুধই আনেনি। ওর ওষুধপত্র আসে ব্যাঙ্কক থেকে। পুরোটাই আমার হোক্স!

—আপনি কাগজপত্রে কিছু লেখাপড়া করে রাখেননি!

—ওর সঙ্গে আমার দারুণ একটা বিশ্বাসের সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। সবই মুখে মুখে হতো। কলকাতায় গ্র্যান্ডে ও দু'দিন আমায় খাইয়েছে। সুতরাং লিখে নেবো কী করে? শুধু মাল ডেলিভারি নেবার সময় ও ভাউচারে সই করেছিল। সেই কাগজটা দেখালাম। ওর সেক্রেটারি বললো, সেটা বলবীর বাহাদুরের হাতের লেখাই নয়!

—যে কোনো জোচ্চোর ইচ্ছে করলে একটা অন্যরকম সই করতেই পারে। কিন্তু তার আগে জানা দরকার, যে বলবীর বাহাদুর আপনার ওষুধ কিনেছে, আর এখানকার ব্যবসায়ী বলবীর বাহাদুর একই লোক তো? আপনাকে অন্য কেউ ওর নাম করে ধাপ্পা দেয়নি?

গোলাম নবী বললো, না, না, কোম্পানির নাম একই আছে। তা ছাড়া ঐ অফিসে দূর থেকে জানলা দিয়ে আমি বলবীর বাহাদুরকে দেখেই চিনেছি। সেইজন্যই বলবীর বাহাদুর আমার সামনে আসছে না। এখন কী করবো বলুন তো?

—বুঝতেই পারছেন, এটা এক ধরনের সুপরিকল্পিত চিটিং। হয়তো আপনার মতন আরও কয়েকজন কলকাতার ব্যবসায়ীকে ও

ঠকিয়েছে। এখন আপাতত দু'এক বছর ও আর কলকাতায় যাবে না। ব্যাংকক থেকে মালপত্র কিনবে। তারপর সেখান থেকে কিছু গোলমাল করে সরে পড়বে হংকং কিংবা সিংগাপুর।

—দেখুন রানা সাহেব, আমি অতি ছোট ব্যবসায়ী। আর এ লাইনে নতুনও বটে। হঠাৎ এতগুলো টাকার ক্ষতি সামলাতে আমি হয়তো ভেঙে পড়বো না, তবে সামলে উঠতে বেগ পেতে হবে ঠিকই। আমি ইন্ডিয়ান, ওকে ইন্ডিয়ার মধ্যে হলে, কলকাতায় হলে ঠিকই শায়েস্তা করতে পারতাম। কিন্তু নেপালে আমি তো বলবীর বাহাদুরের টিকিটাও স্পর্শ করতে পারবো না। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে না চাইলে আমার অন্য আর কী উপায় আছে?

—আপনি মুসলমান বলে আপনার আরও একটা ডিসঅ্যাড-ভানটেজ আছে। বলবীর বাহাদুর যদি এখন কিছুদিন পশুপতিনাথ মন্দিরে ঢুকে বসে থাকে, তাহলে আপনি তার ধারে কাছেও যেতে পারবেন না!

—আপনি ঠিক ধরেছেন, রানা সাহেব। আমি যদি কোনো হিন্দুকে ঠকিয়ে মক্কায় চলে যাই, এমনকি কোনো মিডল ইস্ট কান্ট্রিতে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকি, কেউ আমার ধরা-ছোঁওয়া পাবে না!

—তাহলে এখন কী করতে চান?

গোলাম নবী হঠাৎ কথা থামিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো শংকর রানার দিকে। তার মুখে খেলা করতে লাগলো করুণ ছায়া।

খানিকটা শিশুর মতন অসহায় গলায় সে বললো, আমার আসল সংকট কী জানেন? ঐ টাকাটা নয়!

—তবে?

—আমি নিজেকেই ভয় পাচ্ছি।

—আর একটু বুঝিয়ে বলুন!

—পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি ঠিক করেছিলাম, আর আমি হিংসা-মারামারির মধ্যে কখনো থাকবো না। কোনো মানুষের গায়ে হাত তুলবো না, কারুর ক্ষতি করবো না। নির্ঝঞ্ঝাট, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করবো। এই একটা বছর মোটামুটি সেরকমই চলছিল। কারুকে আমি ঠকাইনি, কারুর সঙ্গে চোখ

রাঙিয়েও কথা বলিনি। কিন্তু বলবীর বাহাদুর এ কী করলো বলুন তো ? অকারণে সে কেন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে ? আমি কারুকে ঠকাই না, নিজেও ঠকতে চাই না। এ লোকটা আমার এক লাখ বারো হাজার টাকা মেরে দেবে, তা আমি মুখ বুজে সহ্য করবো ? শংকরবাবু, আমার এমন রাগ হচ্ছে যে, আমার মধ্যে সেই পুলিশ অফিসারটি আবার জেগে উঠছে। এক এক সময় অসম্ভব হিংস্র হয়ে উঠছে আমার মুখ। আমি, আমি ওকে খুন করবো ! নির্ঘাৎ ওকে খুন করবো !

—অতটা উত্তেজিত হবেন না নবী সাহেব !

—আমি যে রাগ সামলাতে পারছি না। সেটাই আমার ক্ষতি ! আমি জানি, নেপালে বসে আমি যদি এখানকার একজন বড় ব্যবসায়ীকে খুন করি, তাহলে কোনো মতেই নিষ্কৃতি পাবো না, আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ! তবু আমি ঐ লোকটার এই নষ্টামি মেনে নিতে পারবো না।

—শান্ত হোন ! এক কাপ কফি খান তো ! আমি দেখছি, কী করা যায় ! বলবীর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে শুনি সে কি চায়। তার আগে আপনি দুম করে ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসবেন না !

রুমা মুখ তুলে শংকরের দিকে তাকালো। তার দু'চোখে স্পষ্ট আপত্তি।

শংকর বললো, আমি ট্রাবল শুটার। কেউ কোনো বিপদের মধ্যে পড়লে তাকে সাহায্য করা আমার ধর্ম। তা ছাড়া নবী সাহেব আমার বন্ধু মানুষ, এক সময় আমার উপকার করেছেন !

রুমা বললো, তুমি যে বলেছিলে, টাকা-পয়সার গণ্ডগোলের মধ্যে তুমি কখনো মাথা গলাও না। সেটা তো পুলিশের কাজ। নবী সাহেব বিপদে পড়েছেন ঠিকই। তুমি এক লাখ বারো হাজার টাকা ওঁকে দিয়ে দাও তোমার থেকে !

গোলাম নবী বললো, না, না, সে প্রশ্নই ওঠে না। শংকর রানার কাছ থেকে আমি টাকা নেবো কেন ? উনি আমার টাকাটা উদ্ধার করে দিলে তার টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট উনিই পাবেন।

শংকর হেসে বললো, এর মধ্যে টাকা-পয়সার কোনো প্রশ্নই

আসছে না। লোকের টাকা উদ্ধার করে দেওয়া আমার কাজ নয়। গোলাম নবীর সমস্যা হচ্ছে, ওঁর মনের মধ্যে আবার জেগে উঠছে হিংস্রতা। মানুষ খুন করার ইচ্ছে। সেই হিংস্রতা দূর করাই আমার কাজ।

গোলাম নবী শঙ্করের হাত জড়িয়ে ধরে ব্যাকুলভাবে বললো, টাকাটা যায় যাক। আপনি আমার মনের সুস্থতা ফিরিয়ে দিন। তাহলে আমি সারা জীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো!

।। চার ।।

বলবীর বাহাদুরের বাড়ির সামনে এসে শঙ্কর বেশ অবাক হয়ে গেল।

নিউ রোডে আধুনিক কায়দায় বাড়ি. সামনে দু'তিনটি জাপানি গাড়ি, বাইরের বারান্দা, বসবার ঘরের মেঝে সব মার্বেলের। দেখলেই মনে হয়, লোকটি অত্যন্ত কোটিপতি তো হবেই। এ রকম ধনী লোক মাত্র এক লাখ বারো হাজার টাকা ঠকাতে পারে?

বলবীর বাহাদুরের অফিসে দু'বার গিয়েও দেখা করতে পারেনি শঙ্কর। সে সব সময় ব্যস্ত, কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই।

বলবীর বাহাদুরের ছেলে নরোত্তম এককালে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। এখন সে বাবার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই নরোত্তমের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে শঙ্করের পরিচয় আছে। তাকে ধরে সে নরোত্তমের সঙ্গে যোগাযোগ করলো। নরোত্তম তার বাবার সঙ্গে শঙ্করের দেখা করিয়ে দিতে রাজি হয়েছে। রাত এখন আটটা।

বসবার ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নরোত্তম এসে ঢুকলো। পুরোদস্তুর সুটের ওপর একটা ওভারকোট চাপানো। গতকাল রাতে খুব বৃষ্টি পড়ায় আজ কাঠমাণ্ডু বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু ওভারকোট পরার মতন শীত নেই। অনেকে দামি দামি গরম জামা-কাপড় অন্যদের জন্যই অপ্রয়োজনেই ব্যবহার করে। ওভার-কোট গায়ে নরোত্তমকে জবরদস্ত পুরুষের মতন দেখাচ্ছে।

ঘরে ঢুকেই সে বললো, চলুন ! বাইরে আমার গাড়ি আছে। আপনি গাড়ি আনেননি তো ?

শঙ্কর বললো, কোথায় যাবো ? আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হবে না ?

নরোত্তম বললো, বাবা এখানে নেই। অন্য এক জায়গায় ডিনার খেতে গেছেন। আপনার নাম শুনেই চিনতে পেরেছেন বাবা। আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে বলেছেন।

শঙ্কর বললো, উনি অন্য কারুর বাড়িতে ডিনার খেতে গেছেন। সেখানে গিয়ে আমি ডিস্টার্ব করতে চাই না। আমি তাহলে কাল সকালে আসবো ?

নরোত্তম বললো, আজই চলুন। বাবা যেখানে গেছেন, সেটাও আমাদেরই বাড়ি। অন্য দু'একজন অতিথি আসবেন। ড্রিংকসের ব্যাপার থাকলে বাবা এ বাড়িতে কখনো পার্টি দেন না। আমার মা পছন্দ করেন না।

—বিনা নিমন্ত্রণে সেখানে যাওয়াটা অভদ্রতা হবে না ?

—আমিই তো আপনাকে নেমন্তন্ন করছি। বাবাও বিশেষ করে আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আপনার বাবাকে আমার বাবা চিনতেন।

বাইরে বেরিয়ে নরোত্তম তার টয়েটো গাড়িতে শঙ্করকে চাপালো। গাড়ি সে নিজেই চালাবে। স্টার্ট দেওয়া মাত্র গাড়িটা হুস করে বেরিয়ে গেল। ফুটবল খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ড ছিল নরোত্তম, এখনও তার জীবন চলে তীব্র গতিতে।

শহর ছাড়িয়ে গাড়ি চললো পল্টনের দিকে।

নরোত্তম একটা হুইস্কির বোতল থেকে চুমুক দিতে দিতে বললো, বাবার সামনে আমি এসব খাই না। তাই আগে একটু খেয়ে নিচ্ছি। আপনি নেবেন নাকি ?

শঙ্কর বললো, আমি বরং আপনার বাবার সামনেই একটু খাবো। এখন থাক।

নরোত্তমের সঙ্গে কিছু একটা গল্প করা উচিত ভেবে শঙ্কর খেলার প্রসঙ্গ তুললো। তাই নিয়ে কেটে গেল প্রায় আধ ঘণ্টা।

বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়ি এক সময় ঢুকলো একটা সরু রাস্তায়।

তারপর ফাঁকা জায়গায় একটা বাড়ির সামনে এসে থামলো। এ বাড়ির সামনেও দু'খানা গাড়ি দাঁড়িয়ে।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে বাড়িটা কত বড়। একতলায় বেশ কয়েকটা ঘর ও বারান্দা পেরিয়ে একটা ছোট্ট ঘরে এসে ঢুকলো ওরা। এখানে আর কোনো লোক আছে বলে মনে হয় না।

ছোট ঘরটিতে একটি ডাইনিং টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে বসে আছে বলবীর বাহাদুর। তার বয়েস ষাটের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভালো নয়। মুখখানা দেখলে মনে হয়, এর মধ্যে তার একটা কোনো কঠিন অসুখ হয়ে গেছে।

একটা ছোট্ট গ্লাসে হাল্কা লাল রঙের কোনো ওয়াইন পান করছে বলবীর বাহাদুর। ওদের দু'জনকে দেখে বললো, এসেছো ? বসো !

শঙ্কর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেও নরোত্তম দাঁড়িয়ে রইলো।

শঙ্কর লক্ষ্য করলো যে টেবিলে মাত্র চারখানা প্লেট পাতা। নরোত্তম বলেছিল, এখানে পার্টি হবে, অথচ মাত্র চারজন খাবে ? নরোত্তম বসলো না, সে কি তার বাবার সামনে খাবারও খায় না ?

বলবীর বাহাদুর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তুমি বীরেন্দ্রর ছেলে ? তোমাকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেখিনি কেন ?

শঙ্কর বললো, আমি কাঠমাণ্ডুতে বেশিদিন থাকিনি। মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করেছি মাত্র।

বলবীর বাহাদুর বললো, তুমি কিছু পান করবে ? স্কচ কিংবা ব্র্যাণ্ডি ?

শঙ্কর বললো, আপনি যে ওয়াইন খাচ্ছেন, ওটা খেতে পারি।

বলবীর মুখ তুলে বললো, নরোত্তম, ব্যবস্থা করো !

নরোত্তম নিজে না গিয়ে চেঁচিয়ে অন্য কাকে যেন হুকুম করলো।

শঙ্কর বললো, আমি এখানে এসে আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্য দুঃখিত। আমার দরকার অতি সামান্য।

বলবীর বললো, তুমি মোটেই আমাকে ডিসটার্ব করোনি।

আমি তোমার অপেক্ষাতেই এখানে বসে আছি! আমার অফিসের লোকেরা তোমার খবর আমাকে দেয়নি, তারা অতি গাধা!

শঙ্কর অবাক হয়ে তাকাতেই বলবীর হাত তুলে বললো, তোমার কী দরকার, সেটা আগে বলো! কাজের কথা আগে সেরে নেওয়া যাক!

শঙ্কর একটুক্ষণ থেমে বললো, আপনি গোলাম নবী বলে কারুকে চেনেন?

বিনা দ্বিধায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলবীর বললো, হ্যাঁ, চিনি। কলকাতায় ওষুধের ব্যবসা করে।

—আপনি তার সঙ্গে ব্যবসা করেছেন?

—হ্যাঁ, অনেকবার।

—আপনি সম্প্রতি ওর কাছ থেকে এক লক্ষ বারো হাজার টাকার ওষুধ নিয়েছেন?

—হ্যাঁ, নিয়েছি।

—গোলাম নবী এখন কাঠমাণ্ডুতে আছে, তা জানেন?

—জানি!

—গোলাম নবী আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও পারছে না।

—তাও জানি।

—আপনি ওর টাকা দিতে চান না?

হঠাৎ রেগে উঠে বলবীর বললো, কে বলেছে? আমি আজ পর্যন্ত কোনো লোকের টাকা মারিনি। আমি সৎ ব্যবসায়ে বিশ্বাস করি। এ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না যে আমি তার একটা পয়সাও ঠকিয়েছি!

শঙ্কর বললো, ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেও দেখা পাচ্ছে না। তাহলে সে তার টাকা পাবে কী করে?

—যেদিন আমার দেখা পাবে, আমার সামনে এসে উপস্থিত হবে, সেদিন টাকাটা ঠিকই পেয়ে যাবে!

—আপনি তাকে দেখাই করতে দেবেন না, অথচ বলছেন, টাকাটা সে পেয়ে যাবে, এর ঠিক মানে বোঝা যাচ্ছে না।

—অতি সহজ ব্যাপারও অনেক সময় খুব শক্ত লাগে। যাই

হোক, তুমি এবার বলো তো, এ গোলাম নবী লোকটার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক? তুমি ওর হয়ে দালালি করতে এসেছো কেন? ওর টাকা আদায় হলে তুমি বুঝি তার বখরা পাবে আশা করেছিলে?

—আমি ওর টাকা আদায় করতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি, আপনার মতন একজন ধনী ব্যক্তি একজন লোকের সামান্য টাকা দিতে রাজি হচ্ছেন না কেন? আপনি নেপালের একজন ব্যবসায়ী। আপনার একটা সুনাম আছে, আপনি আমার একজন ভারতীয় বন্ধুকে ঠকাবেন!

—ঐ লোকটা তোমার বন্ধু?

—ঐ গোলাম নবী এক সময় আমার কিছু উপকার করেছিলেন। নিঃস্বার্থভাবে।

—ঐ লোকটা তো আগে পুলিশ অফিসার ছিল। পুলিশ কখনো কারুর উপকার করে?

—বলতে গেলে আমারই জন্য সে পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে!

—হুঁ, তা হলে ঠিকই মিলেছে। তুমি একটা চোর আর ঐ গোলাম নবী একটা পুলিশ। তুমি একটা মেয়ে চুরি করেছিলে, ঐ গোলাম নবী তোমাকে ধরতে গিয়ে ঘুষ খায় তোমাকে ছেড়ে দেয়। তাই না? তুমি কত টাকা ঘুষ দিয়েছিলে, শঙ্কর?

শঙ্কর সারা শরীর ঝাঁকিয়ে হাসলো।

ওয়াইনের বোতল থেকে আর একটু ঢেলে নিল নিজের গেলাসে। লম্বা একটি চুমুক দিয়ে বললো, আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি! ঘুষের টাকাটা তখন ওকে দিইনি, বাকি রেখেছিলাম। এখন দিয়ে দিতে পারি। এক লক্ষ বারো হাজার টাকা। অত টাকা আমার হাতে নেই আপাতত। সুতরাং আপনাকেই ধার দিতে হবে!

—ধার? জীবনে আমি কারুকে এক পয়সা ধার দিই না।

—জীবনে আগে অনেক কিছুই করেননি, যা এখন করছেন। মানুষকে ঠেকে শিখতে হয়।

—তোমাকে একটা সত্য ঘটনা বলি শোনো, শঙ্কর। তোমার খিদে পায়নি তো? আর আধ ঘণ্টা পরেই পাবো।

—না খিদে পায়নি। আপনি ঘটনাটা বলুন।

—গোলাম নবীকে টাকাটা আমি প্রথম দিনেই দিয়ে দিতাম। তার কাছ থেকে মাল নিয়েছি, তার দাম দেবো না কেন? কিন্তু সেদিন আমি অফিস ঘরে বসে অন্য একজনের সঙ্গে একটা নতুন ব্যবসার কথা আলোচনা করছিলাম। খুব বড় একটা ব্যবসার ব্যাপার। সেই ভদ্রলোক হঠাৎ কথা বলতে বলতে জানলা দিয়ে গোলাম নবীকে দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ঘুষখোর পুলিশটা আপনার কাছে আসছে কেন? আমি বললাম, ঐ লোকটা এখন আর পুলিশ নয়। এখন ওষুধের ব্যবসা করে, আমি ওর কাছ থেকে মাল নিই। সেই কথা শুনে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি দারুণ চটে গেলেন। আমাকে ওর সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা বললেন। তারপর বললেন, খবর্দার টাকা দেবেন না, ওর শাস্তি পাওয়া দরকার।

—সেই ব্যবসায়ীটি ভারতীয়? কলকাতার?

—আমি তোমার কাছে তার নাম বলবো না।

—ঠিক আছে, তারপর কী হলো বলুন!

—তিনি ঐ কথা বলার পর আমি বললাম, দেখুন, ওর ওপর আপনার রাগ থাকতে পারে, কিন্তু আমি ওর কাছ থেকে মাল নিয়েছি, তার দাম দেবো না কেন? এরকম বেইমানি আমি করতে পারি না। এটা আমার ধর্মে বারণ। তখন তিনি বললেন, ঠিক আছে, টাকা দেবেন। কিন্তু অন্তত সাত দিন আটকান। এই সাত দিন ওকে বারবার আটকান, ওকে অপমান করুন, আপনার লোককে বলুন, ওকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে!

—এর পরের অংশটা বলে দিচ্ছি!

—তুমি কী করে জানবে, শঙ্কর?

—যে-কোনো ঘটনা খানিকটা শুনে বাকিটা বুঝে নেওয়াই তো আমার কাজ। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক গোলাম নবীকে টাকা না দিয়ে, অপমান করে ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন একটা উদ্দেশ্যে। গোলাম নবী এখন আর পুলিশ অফিসার নয়। তার বিশেষ ক্ষমতা নেই। এরকম বিপদে পড়ে সে কার কাছে সাহায্য চাইবে? নেপালে একজনের সঙ্গেই তার চেনা আছে, যাকে সে এক সময় কিছু সাহায্য

করেছিল। তার কাছেই যাবে!

—সেই লোকটাই তুমি! শঙ্কর রানা!

—সেই ভারতীয় ব্যবসায়ীটি আমাকেই ধরতে চেয়েছিলেন!

—ঠিক ধরেছো। তিনি বললেন, আপনি দেখবেন, চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে শঙ্কর রানা নামে অতি বদ একটা লোক। তাকে ধরে আমার হাতে তুলে দেবেন। ব্যস, তারপর আপনার আর কোনো দায়িত্ব নেই। এর পর আপনি গোলাম নবীকে টাকাটা দিয়ে দিতে পারেন।

—আমাকে ধরে রাখতে বলেছেন? আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে?

—তোমার ইচ্ছে থাকে তো ভালোই। আর যদি ইচ্ছে না থাকে, তাহলে জোর করেই ধরে রাখতে হবে। উপায় কী বলো?

—আপনি নেপালি হয়েও আমাকে একজন ভারতীয়র হাতে তুলে দেবেন?

—ব্যবসার ব্যাপারে আবার অত সব জাত-ধর্ম মানলে চলে নাকি? ওনার সঙ্গে আমি একটা জয়েণ্ট কোলাবরেশনে নামতে যাচ্ছি। অনেক টাকার ব্যাপার। ওনাকে কি আমি চটাতে পারি?

—আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন!

ওসব বাজে কথা। তোমার বাবা বীরেন্দ্র সব সময় অহঙ্কারে মটমট করতো। খানিকটা লেখাপড়া জানতো বলে আমাকে সে মানুষ বলেই মনে করতো না। সে দু'তিনবার আমাকে বিশ্রীভাবে অপমান করেছে। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, একদিন ঠিক তার শোধ তুলবো।

—বাবার ওপর রাগ করে আপনি ছেলের ওপর শোধ তুলছেন? আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য অরুণ বাজোরিয়া আপনাকে কত টাকা দেবে বলেছে?

—তুমি তো সাঙ্ঘাতিক ছেলে দেখছি! সেটা বুঝলে কী করে?

—ব্যবসার জগতে টাকা-পয়সা ছাড়া কোনো লেনদেন হয় না। ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা, দেশপ্রেম এসবও অনেক সময় তুচ্ছ হয়ে যায়, তাই না?

—দ্যাখো, আমি সব সময় সত্যি কথা বলি। তোমাকে ধরিয়ে

দেবার মতন একটা ঝুঁকির কাজ করতে গেলে কিছু তো পেতেই হবে। তোমার দাম পাঁচ লাখ টাকা। সেই ভদ্রলোক এসে পড়লেই তোমাকে তাঁর হাতে তুলে দেবো। তবে, একটা কথা বলে নিয়েছি, তোমাকে শাস্তি দেবার ব্যাপারটা ওঁকে ইণ্ডিয়ায় নিয়ে গিয়ে করতে হবে। নেপালে তোমার ডেড বডি পাওয়া গেলে আমি জড়িয়ে পড়বো!

—ওরে বাবা, এত দূর শাস্তি! আমি একেবারে ডেড বডি হয়ে যাবো?

—তুমি ওর মেয়েকে চুরি করেছ, এখন ওঁর যা খুশি শাস্তি দেবেন!

শঙ্কর মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলো, নরোত্তম দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা রিভলভার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এবার বোঝা গেল তার ওভারকোট পরার আসল রহস্য। নরোত্তমকে ঠিক এখন আমেরিকান সিনেমার কোনো দস্যুসর্দারের মতন দেখাচ্ছে। ঠোঁট থেকে একটা সিগারেট ঝুললে আরও মানাতো. কিন্তু নরোত্তম তার বাবার সামনে সিগারেট খায় না।

নরোত্তম দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, নো ফানি বিজনেস। ঐ চেয়ার ছেড়ে নড়বার চেষ্টা করো না। চালাকি করলেই গুলি চালাবো।

বলবীর বাহাদুর ছেলেকে বললো, ওরে এর পকেট টকেট দেখে নে, রিভলবার বা অন্য কোনো অস্ত্র আছে কি না!

শঙ্কর এক গাল হেসে বললো, আমি বন্দুক-পিস্তল, ছোরা-ছুরি কিছু রাখি না। আমি ম্যাজিশিয়ান, আমার ওসব কিছু লাগে না।

নরোত্তম এগিয়ে এসে শঙ্করের সব পকেট চাপড়ে দেখলো। সত্যিই কিছু নেই।

তারপর সে বললো, তোমার হাত দুটো তোলো। আমি হাত বাঁধবো।

শঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে বলবীর বাহাদুরকে বললো, আমি আপনাদের সম্পর্কে ভাবি, যথেষ্ট টাকা তো করেছেন, বাড়ি-গাড়ি-সম্পত্তি কিছুরই তো অভাব নেই। এরপর আরও টাকা রোজগার

করে কী করবেন ? টাকা চিবিয়ে খাবেন ? নাকি মৃত্যুর পর স্বর্গে নিয়ে যাবেন টাকা-পয়সা ?

নরোত্তম বিরাট গলায় চোপ বলেই ঠাস করে এক থাপ্পড় কষালো শঙ্করের গালে।

শঙ্করের মুখ থেকে তবু হাসি মিলিয়ে গেল না। সে রাগলো না।

শান্তভাবে বললো, ছিঃ, সদ্য চেনা ভদ্রলোকের গায়ে কক্ষণো হাত তুলতে নেই। অন্য কারুকে মারতে গেলে নিজেকেও মার খেতে হয়, তা জানো না ?

সঙ্গে সঙ্গে সে নরোত্তমের রিভলভার সমেত হাতটা চোখের নিমেষে চেপে ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। সেই টানে অতবড় চেহারা নিয়েও শূন্যে উঠে গেল নরোত্তম। শঙ্কর তাকে ছুড়ে ফেলে দিল তার বাবার গায়ের ওপর।

বলবীর বাহাদুর কোনোরকমে সরে গিয়ে মাথাটা বাঁচালো। রিভলভারটা ছিটকে পড়েছে ঘরের এক কোণে। সেটা তোলার জন্য শঙ্কর কোনো ব্যস্ততা দেখালো না।

বলবীর বাহাদুর বললো, তোমাকে আটক করা খুব সহজ হবে না, তা আমি জানতাম। আমার ছেলেটা একেবারে অপদার্থ ! তবে, শঙ্কর তুমি ঐ রকম কিছু করতে যেও না। ঐ দ্যাখো !

শঙ্কর দেখলো, আরও, দুজন ষণ্ডামার্কা লোক রিভলভার হাতে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

শঙ্কর জামায় হাত মুছতে মুছতে বললো, আমি তো পালাবার চেষ্টা করিনি। আপনার ছেলে অভদ্রতা করেছিল বলে ওকে একটু শিক্ষা দিলাম। আমি তো অরুণ বাজোরিয়ার সঙ্গে দেখা করতেই চাই। আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না।

বলবীর বাহাদুর বললো, শাট আপ ! এবার তোমার হাত শুধু নয়, মুখও বাঁধতে হবে !

এই সময় অরুণ বাজোরিয়া গুণ্ডা দুটিকে সরিয়ে ঢুকলো। শঙ্করের আপাদমস্তক দেখে বললো, ঠিক আছে। মুখ বাঁধার দরকার নেই। শুধু হাত বাঁধলেই চলবে !

শঙ্কর বললো, হাত বাঁধবেন ? তা হলে আগে প্রণামটা সেরে

নিই।

সত্যি সত্যি সে নিচু হয়ে অরুণ বাজোরিয়ার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। সেই অবস্থায় জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছেন? আপনার স্ত্রীর শরীর ভালো আছে তো?

অরুণ ত্রস্তে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললো, ছুঁবি না। আমাকে ছুঁবি না। নরকের কীট!

শংকর বললো, আপনি নরক দেখেছেন নাকি? কী করে জানলেন, সেখানকার কীটরা কেমন হয়?

অরুণ ঘৃণায় মুখটা কুঁচকে সরে এলো। বলবীরকে বললো আমার গাড়ি রেডি আছে। আপনার লোকদের বলুন, ওর হাত দুটো বেঁধে আমার গাড়িতে তুলে দিতে। আমি এই রাত্তিরেই ল্যাণ্ড রুটে ইণ্ডিয়ার দিকে রওনা হয়ে যাবো।

নরোত্তম উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত কিড়মিড় করছে।

বলবীর তাকে ধমক দিয়ে বললো, এই, তুই সরে যা!

দু'জন গুণ্ডা একটা লোহার শেকল নিয়ে এলো শংকরের হাত বাঁধার জন্য। শংকর বিন্দুমাত্র আপত্তি জানালো না। বেশ বাধ্য ছেলের মতন সহযোগিতা করলো তাদের সঙ্গে।

তারপর তাকে যখন ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বলবীর বাহাদুরকে বললো, আমি যে প্রশ্নটা করেছিলাম, তার উত্তরটা ভেবে রাখবেন। আমি পরে এসে শুনবো। আর একটা কথা। আপনার চুক্তি মতন কাজ তো হয়ে গেল, এরপর গোলাম নবীকে টাকাটা দিতে নিশ্চয়ই কোনো বাধা নেই? কাল সকালেই দিয়ে দেবেন!

।। পাঁচ ।।

গাড়ি ছুটছে অন্ধকার পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে।

সামনে ড্রাইভারের পাশে একজন অস্ত্রধারী পাহারাদার। পেছনে শংকর আর অরুণ। সবাই নিঃশব্দ। বিপজ্জনক ঘাটের রাস্তা। অসংখ্য বাঁক। এই রাস্তায় সচরাচর রাত্রে কেউ গাড়ি চালায়

না। ড্রাইভারটি খুবই দক্ষ।

শংকর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। তার পাশে অরুণ বাজোরিয়ার ঝিমুনি এসে যাচ্ছে দেখে সে বললো, শ্বশুরমশাই, আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি আমাকে মেরেই ফেলবেন, ঠিক করেছেন?

অরুণ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, হ্যাঁ!

শংকর বললো, কিন্তু আমি মরলে আপনার মেয়ে যে বিধবা হবে, তা ভেবে দেখেননি? রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছি, সেটা তো আর মিথ্যে হবে না!

অরুণ দাঁত ঘষে বললো, হোক আমার মেয়ে বিধবা। আমি তার আবার বিয়ে দেবো।

এ বিষয়ে আপনার স্ত্রীর মত নিয়েছেন? তিনি মা হয়ে কি মেয়ের বৈধব্য চাইবেন?

—চুপ করো। তার নাম উচ্চারণ করবে না!

—আপনি আমার ওপর এত রেগে গেছেন কেন বলুন তো? বাইরের লোকদের আপনি যাই বোঝান, আপনি নিজে তো ভালোই জানেন যে আপনার মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমি বিয়ে করিনি। তাকে আমি তিনবার ভালো করে ভাববার সুযোগ দিয়েছিলাম। তিনবারই সে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে আমার কাছে চলে এসেছিল।

—তোমার ওপর আমার আসল রাগের কারণটা শুনবে? তুমি বেইমান! আমি তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম যে তোমার এই নীতিবোধটুকু থাকবে যে কোনো কাজের দায়িত্ব নিয়ে সেটা পালন করতে হয়।

—নীতিবোধ আমার আছে ঠিকই। কিন্তু শাস্ত্রকাররা বলেছেন, প্রেমে ও রণে সবরকম রীতি ভঙ্গ করা করা যায়। প্রেম কি যুক্তি মানে?

—আমার মেয়ের সঙ্গে যাতে আমার সম্পর্ক নষ্ট না হয়, কেন সে আমাকে দেখলে ভয় পায়, এসব কিছুর জন্য তোমাকে আমি নিযুক্ত করেছিলাম। তার বদলে তুমি আমার মেয়েকে ছিনিয়ে নিলে আমার কাছ থেকে? এর নাম প্রেম?

—সত্যিই প্রেমের ক্ষেত্রে এরকম হয়। আপনার জীবনে হয়তো প্রেমের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, তাই আপনি বুঝবেন না। তবে আমি এমন কিছু খারাপ পাত্র নই, আপনারা যদি এ বিয়েতে রাজি হতেন, তাহলে এটাকে ঠিক ছিনিয়ে নেওয়া বলা যেত না।

—তুই আমার চাকর! তোকে টাকা দিয়ে আমার একটা কাজে লাগিয়েছিলাম। একটা চাকরের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেবো?

—ভালো করে ভেবে দেখুন, এই দুনিয়ায় প্রায় সবাই চাকর। সব কাজই টাকার বিনিময়ে অন্যের ইচ্ছে অনুযায়ী করতে হয়। আপনি ভাবছেন, আপনি মালিক। আপনি যখন একটা ব্রিজ বানাবার কন্ট্রাক্ট নেন, তখন আপনাকে গভর্নমেণ্টের ধমকানি শুনতে হয় না? এই যে নেপালে এসে জয়েন্ট ব্যবসা করতে চাইছেন, এর মধ্যে মন্ত্রীদের সামনে আপনাকে দেঁতো হাসি হেসে হাত কচলাতে হয়নি? কেউ ছোট চাকর, কেউ বড় চাকর। মন্ত্রীরাও চাকর। এমনকি রাজাও জনগণের চাকর।

—চুপ কর। বড় বড় কথা বললে তোর মুখ বেঁধে দেবো!

—আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না। একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। হাত বাঁধা, একটা সিগারেট ধরিয়ে দেবেন? আমার পকেটে আছে।

শংকরের ইয়ার্কির সুর শুনে অসম্ভব রেগে গেল অরুণ। কী যে করবে ভেবে পেল না। অন্য কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে শুধু বললো, না, হবে না!

শংকর হালকা ভাবেই বললো, আমাকে মেরেই ফেলতে চান, তার আগে আমার একটা সামান্য সাধও মেটাতে চান না? আপনি কাঠমাণ্ডুতে এসে খোঁজ-খবর নিলে জানতে পারতেন, আমাদের বংশ খারাপ কিছু নয়। ঐ বলবীর বাহাদুরের চেয়ে আমরা অনেক খনেদী। আপনার মেয়ে তেমন কোনো খারাপ ঘরে পড়েনি।

অরুণ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, আমি বলে এসেছি, কাল দুপুরেই একজন গিয়ে আমার মেয়ের কাছে তোর মৃত্যুসংবাদ দেবে। একটা বেলা সে কান্নাকাটি করুক। পরশুদিন ওর মা এসে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে ওকে।

—পৃথিবী থেকে একেবারে হারিয়ে যাবে শঙ্কর রানা? ছি ছি

ছি। এমন প্রাণের অপচয় কি ঠিক !

—তোর মত পাপীরা পৃথিবী থেকে যত কমে ততই মঙ্গল।

—আমি জেনেশুনে কোনো পাপ তো করিনি এ পর্যন্ত ! কিন্তু আপনি করেছেন ! বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, আপনি করেননি ! মানুষ মারা সবচেয়ে জঘন্যতম পাপ। আপনি কত মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী ? আপনার হাতে কত রক্ত !

—আমি কক্ষণো, কোনো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী নই !

—আপাতত তো আমাকেই মারতে বসেছেন। আমাকে যদি শাস্তি পেতেই হয়, তবে তা দেবে সরকার। কিংবা ভগবান। আপনি নিজে কেন আমাকে গোপনে খুন করতে চলেছেন ? নৈহাটিতে হঠাৎ আপনার একটা কারখানা লক-আউট করে দিলেন, দেড় হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে গেল। তাদের পরিবার না খেয়ে কাটাচ্ছিল দিনের পর দিন। দুজন শ্রমিক আত্মহত্যা করলো, একজন তার দুটো বাচ্চাকে আছড়ে মারলো। আপনি এর জন্য দায়ী নন ?

—না !

—জোর দিয়ে 'না' বললেই কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যায় ?

—তুই আমার সম্পর্ক অনেক কিছু জেনে ফেলেছিস, সেটাও তোর মৃত্যুর একটা কারণ।

—আপনি আমার ওপর ভার দিয়েছিলেন আপনার মেয়ের গতিবিধি জানতে। সে কাজ করতে গিয়ে আপনার জীবন সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা হয়ে গেছে। এটা তো স্বাভাবিক তাই না ? কিন্তু আপনি আমার পেছনে লোক লাগিয়েছিলেন। আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি। বেশি কিছু জেনে ফেললে আমাকে আপনি পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আপনাকে আমি প্রথম দিনই তো বলেছিলাম, আমাকে সরিয়ে ফেলা সহজ নয় !

—আজ একটু পরেই বুঝবি, সহজ না শক্ত ! নেপালের সীমানা পেরুলেই তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে একটা নদীতে। ড্রাইভার আর কতক্ষণ লাগবে ?

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বললো, আরও আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা স্যার। বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তা পেছল, তাই বেশি জোরে চালাচ্ছি না।

অরুণ বললো, ঠিক আছে। রুস্তম, তুমি রবারের ডাণ্ডাটা ঠিক রেখেছো তো? একে এমনভাবে মারবে, যাতে কোনো দাগ না থাকে।

বডিগার্ডটি বললো, আপনি চিন্তা করবেন না, স্যার। আমি মেরে মেরে ওর ঘাড়টা ভেঙে দেবো। পরে কেউ ওর বডি খুঁজে পেলে ভাববে, পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে ঘাড় মটকেছে। কোনো চিহ্ন থাকবে না।

শঙ্কর যেন এসব কথা শুনছেই না।

সে জানলা দিয়ে তাকিয়ে অন্ধকার দেখছে। একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ডুবে আছে পাহাড় আর জঙ্গল। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে দু'একটা আলোর ফুটকি! সেখানে কোনো বসতি আছে।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, এখন আমরা কোথা দিয়ে যাচ্ছি? এ জায়গাটার নাম কি, ড্রাইভার?

তার এমন সরল প্রশ্ন শুনে ড্রাইভার উত্তর না দিয়ে পারলো না।

সে বললো, এর একটু পরেই ভাদকো গ্রাম।

শঙ্কর আপন মনে বললো, আমিও তাই আন্দাজ করেছিলাম। ঐ ভাদকো গ্রামে আমার পিসিমার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় অনেকবার এসেছি। ভারি সুন্দর গ্রামটা!

তারপর সে অরুণের দিকে তাকিয়ে বললো, মরতে কেমন লাগে, কে জানে? আচ্ছা, মিঃ বাজোরিয়া, আপনি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন, মরতে কেমন লাগে?

অরুণ বললো, সেটা ভাববার কোনো কারণ তো আমার ঘটেনি! তবে, তুই আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই টের পেয়ে যাবি।

শঙ্কর বললো, বলা তো যায় না। অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্টেও হঠাৎ মরণ আসতে পারে। মনে করুন, এই গাড়িটা উল্টে গেল!

—আমি এত সহজে মরবো না। আমার এখনো অনেকদিন আয়ু আছে।

—কোনো জ্যোতিষী বলেছে বুঝি? আয়ু থাকলেও বড় জোর আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর! তারপর তো মরতেই হবে! কবীর

বাহাদুরকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম, সেটা আপনাকেও করতে চাই। এই যে লোককে ঠকিয়ে, মানুষ মেরে এত টাকা রোজগার করছেন, এতে কী হবে? মানুষের প্রয়োজনের তো একটা সীমা আছে। কোটি কোটি টাকা রোজগার করলেও কেউ তো তা ভোগ করে যেতে পারে না। তবু এত টাকার পেছনে ছোটাছুটি কেন?

—এটাও বুঝিস না, গাধা! অন্যদের থেকে আমি বড় অন্যদের চেয়ে আমি বেশি টাকা রোজগার করতে পারি, টাকা দিয়ে সব রকম ক্ষমতা কিনতে পারি, এই অহঙ্কারটাই তো আসল! এই আনন্দের কোনো তুলনা হয় না। টাটা-বিড়লারা ক্ষমতার সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্যই এত টাকা বানায়।

—কিন্তু হঠাৎ যদি মৃত্যু এসে যায়?

—বোকারাই ওরকম কথা ভাবে! তাহলে সংসার ছেড়ে সাধু হলেই হয়!

—না, সাধু হবার দরকার নেই। মোটামুটি ভালো খেয়ে পরে বাঁচবো, অন্যদের ক্ষতি করবো না, সাধ্য মতন অন্যদের সাহায্য করবো, এই রকম টাকাই তো যথেষ্ট। অন্যদের ঠকানো কিংবা খুন করার চেয়ে, অন্যদের সাহায্য করার আনন্দ কি বেশি না? টাটা-বিড়লার চেয়ে মাদার টেরিজার আনন্দ কি কম?

—তুই বকবক থামাবি? আমি এখন একটু ঘুমিয়ে নেবো। রুস্তম, তুমি এর ওপর নজর রেখো। দরকার হলে গুলি চালাবে।

রুস্তম বললো, ঠিক আছে, স্যার।

শঙ্কর একটা হাই তুলে বললো, আমারও ঘুম আসছে। কিন্তু মৃত্যুর আগে ঘুমোনো ঠিক নয়!

বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে সে বললো, আমি ঠিক করলাম আমি একা মরবো না। অরুণ বাজোরিয়াকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো।

সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনে হেলে গিয়ে, পা দুটো তুলে কাঁচির মতন চেপে ধরলো ড্রাইভারের গলা। একটা হ্যাঁচকা টান মারলো।

স্টিয়ারিং ঘুরে গিয়ে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে গড়াতে লাগলো খাদ দিয়ে।

অরুণ প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠলো। রুস্তম পেছন ফিরতেই শঙ্কর তার চোখের ওপর মারলো একটা ঘুঁষি। সে যন্ত্রণায় চোখ

চেপে ধরলো।

গাড়িটা গড়াচ্ছে। তারই মধ্যে ঠিক হিসেব করে শঙ্কর এবার খুলে ফেললো একটা দরজা। অরুণ বাজোরিয়ার হাত ধরে সে লাফালো বাইরে।

দু'জনে পড়লো পাহাড়ের গায়ে। গাড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে নামতেই লাগলো নিচে।

শঙ্কর সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার হাতে এখন লোহার শেকলের বাঁধন নেই। সে বললো, ঐ ড্রাইভার আর বডি গার্ড, ওরা জেনেশুনে মানুষ খুনের সঙ্গী হয়েছিল। ওদের শাস্তি পাওয়া উচিত। গাড়িটা অনেক নিচে গিয়ে পড়বে। ওখানে গিয়ে ওরা মরতেও পারে, বাঁচতেও পারে, সে ওদের ভাগ্য। আমার কিছু করার নেই।

অরুণ বাজোরিয়া বিহ্বলভাবে বললো, আমি বেঁচে গেছি! তুমি ইচ্ছে করে গাড়িটা উল্টে দিলে?

শঙ্কর তার পকেট থেকে দোমড়ানো সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালো। ধীরে সুস্থে টান দিয়ে বললো, বলেছিলাম না, আমি জাদুকর। আমাকে কোনো দড়ি কিংবা শেকল কিংবা হাতকড়া দিয়েও বাঁধা যায় না! এই জায়গাটা আমার চেনা। ছেলেবেলায় এখানে অনেক খেলা করেছি।

অরুণ বাজোরিয়া একটা গাছ ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সত্যি বেঁচে গেছি! আমরা এখন এখান থেকে কী করে ফিরবো?

শঙ্কর অবাক হবার ভান করে বললো, আমরা মানে? অরুণ বাজোরিয়া ফিরবে কোথায়? একটু আগে সে বলছিল, তার এখনো অনেক দিন আয়ু আছে। সেটা আমি মিথ্যে প্রমাণ করে দেবো। আর ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে অরুণ বাজোরিয়াকে মরতে হবে!

অরুণ অবিশ্বাসের সুরে বললো, তুমি আমাকে মেরে ফেলবে?

—এত অবাক হচ্ছেন কেন? একটু আগে আপনি আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। এখন আমি প্রতিশোধ নিতে চাইবো না?

—না, না, আমাকে মেরো না! আমার অনেক কাজ। তুমি আমাকে মেরো না। তুমি কি চাও বলো! তুমি আমাকে প্রাণে

বাঁচিয়েছো। আমাকে টেনে নামিয়েছো। গাড়ির সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে গেলে আমি এতক্ষণে নির্ঘাৎ খতম হয়ে যেতাম। এখনো আমার শরীর কাঁপছে। উঃ বাপ্স! কী জোর ফাঁড়া গেল একটা। তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো, শঙ্কর! তুমি আমাকে বাঁচালে, তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই!

—আমি আপনাকে বাঁচাইনি!

—আমাকে ভগবান বাঁচিয়েছেন। তা ঠিক। ভগবানই তো জন্ম-মৃত্যুর মালিক। তাঁর দয়াতেই বেঁচেছি। তবু, তুমিই তো নিমিত্ত। তোমার হাত ধরেই আমি···তুমি কী চাও, বলো!

—আমি আপনাকে মেরে ফেলতে চাই। আপনাকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়েছি, আপনাকে বাঁচাবার জন্য নয়। আপনি মৃত্যু-যন্ত্রণা কী করে ভোগ করেন, সেটা নিজের চোখে দেখার জন্য।

—সে কি! না, না, তা হতেই পারে না!

—বিশ্বাসই করতে পারছেন না? অথচ অন্যদের মৃত্যু সম্পর্কে তো চোখের পলকটাও ফেলেন না!

—তোমাকে আমি পাঁচ লাখ টাকা দেবো!

—একটু আগেই আমি বলেছি, আমার বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। আমি টাকা চিবিয়ে খাই না।

সিগারেটটা শেষ করে সে অরুণের কাছে এগিয়ে এলো।

একেবারে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, আমাকে এমনিতে হাসিখুশি মনে হলেও আমার অসম্ভব রাগও আছে। কেউ অপমান করলে আমার সারা শরীর টগবগ করে জ্বলে। বনেদী রানা বংশের রক্ত আছে আমার শরীরে। কেউ আমাকে অপমান করলে তার শোধ না নিয়ে আমি ছাড়ি না!

অরুণ বললো, তুমি টাকার বদলে অন্য কিছু চাও?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শঙ্কর বললো, আপনি মানুন বা না মানুন, সম্পর্কে আপনি আমার শ্বশুর। আপনার চুলে আমাকে হাত দিতে হচ্ছে বলে আমি মাপ চাইছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর অরুণের মাথার চুল মুঠি করে ধরলো। তারপর নিষ্ঠুরভাবে তাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো একটা খাদের ধারে।

তারপর তার পেটে হাঁটুর গুঁতো মেরে ফেলে দিল খাদের মধ্যে।

শুধু চুলের মুঠির টানে শূন্যে ঝুলতে লাগলো অরুণ। তার চুলে পড়পড় শব্দ হতে লাগলো।

বিকট চিৎকার করে অরুণ বলে উঠলো, বাঁচাও! বাঁচাও!

শঙ্কর খাদের ধারে শুয়ে পড়ে বললো, কেউ শুনতে পাবে না। এত রাতে এখানে জন-মনুষ্যও আসবে না।

—চুল এক্ষুণি ছিঁড়ে যাবে। আমি পড়ে যাব! মরে যাবো!

—আপনাকে বেশিক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে তো চাইও না। খাদের মধ্যে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবেন। সবাই জানবে, গাড়ির অ্যাক্সিডেণ্টে আপনি খাদে পড়ে গেছেন। আমি কোনোক্রমে বেঁচে গেছি। এরকম তো হতেই পারে!

—শঙ্কর, শঙ্কর, তুমি তোমার স্ত্রীর বাবাকে মেরে ফেলবে?

—আপনি আপনার মেয়ের স্বামীকে মেরে ফেলতে তো দ্বিধা করেননি!

—স্বামী মরলে আবার স্বামী পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা মরলে কি আর বাবা পাওয়া যায়?

—যে বাবা মেয়েকে বিধবা করতে চায়, সেই বাবার জন্য দরদ থাকবে কোন মেয়ের! রুমা আর কোনোদিন আপনার মুখ দেখতে চায় না।

—চুল ছিঁড়ে যাচ্ছে, চুল ছিঁড়ে যাচ্ছে!

—জানি!

—শঙ্কর তোমাকে আসলে আমি মারতে চাইনি। শুধু একটু ভয় দেখাচ্ছিলাম!

—এতক্ষণ পরে এই কথা!

—তোমাকে আমার মেয়ের স্বামী হিসেবে মেনে নিচ্ছি। তুমি আর রুমা আমার বাড়িতে আসবে।

—আপনি মানুন বা না-মানুন, তাতে কিছুই আসে যায় না। আমরা আপনার বাড়িতে কোনো দিনই যাবো না।

—আমাকে দয়া করো, শঙ্কর! বাঁচাও, বাঁচাও, আমি তোমার চাকর হয়ে থাকবো।

—আমার কোনো চাকরের দরকার নেই। আমি নিজের কাজ নিজেই করে নিতে পারি।

—তুমি কিছুই চাও না!

—না, কোনো কিছুই চাই না। তবে অরুণ বাজোরিয়ার মতন মানুষেরা মরতে কত ভয় পায়, সেটা দেখতে চাই!

—ওঃ ওঃ, গেলাম, গেলাম। সব চুল ছিঁড়ে যাচ্ছে, এবার পড়ে যাবো। আমার ভীষণ লাগছে শঙ্কর! আমি মরতে চাই না! মরতে চাই না।

—আপনার জন্য অন্য যে-সব লোক মরেছে, তারাও সবাই বাঁচতে চেয়েছিল। আপনি তাদের বাঁচতে দেননি! সুতরাং আপনারও বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই।

হঠাৎ এক খাবলা চুল থেকে গেল শঙ্করের হাতে। অরুণ পড়ে যেতে লাগলো খাদে।

শঙ্কর তৈরিই ছিল, অন্য হাতে সে ধরে ফেললো অরুণের কাঁধ। অরুণ তা টের পেল না। সে ঝুলতে ঝুলতে বিড়বিড় করে বললো, ঠিক আছে, তবে মরি! যাক, সব শেষ হয়ে যাক! আর আমি কিছু ভাবতে পারছি না।

শঙ্কর তাকে একটা ঝাঁকুনি দিল।

অরুণ চোখ বুজে ফেলে বললো, আমি কি মরে গেছি? সব শেষ?

শঙ্কর বললো, হ্যাঁ! তোমার সব জ্বালাযন্ত্রণা শেষ হয়ে যায়নি?

অরুণ বললো, অনেক কমে গেছে, আর আমাকে ব্যবসা-পত্তর নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না। কারখানা বন্ধ হলে উপোসী মানুষদের জন্য মনে মনে কষ্ট পেতে হবে না। মেয়েকে ক্ষমা করতে পারিনি বলে নিজের ওপরেই রাগ করতে হবে না। অন্য ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে হিংসেয় জ্বলতে হবে না। টাকার জন্য সবাইকে অবিশ্বাস করতে হবে না।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, অরুণ বাজোরিয়া, এবার বলো তো, মানুষ কি টাকা চিবিয়ে খায়?

—না!

—মানুষ মেরে নিজের টাকা বাড়াবার কোনো প্রয়োজন আছে?

—না।

—অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পাওয়া ভালো ? না অন্যকে আনন্দ দিয়ে নিজেও আনন্দে থাকা ভালো ?

—কী জানি, ঠিক জানি না। এখন আর ভাবতেও পারছি না।

শঙ্কর এক হ্যাঁচকা টানে অরুণকে খাদ থেকে ওপরে তুলে পাথরে শুইয়ে দিল। অরুণ তখনও কিছু বুঝতে পারলো না। চোখ বুজে শুয়ে রইলো একটুক্ষণ। শঙ্কর আর একটা সিগারেট টানতে লাগলো।

খানিক বাদে অরুণ ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কী হলো, আমি মরিনি ?

উত্তর না দিয়ে শঙ্কর শুধু হাসলো।

অরুণ বললো, তুমি আমাকে মারলে না কেন, শঙ্কর ? আমি কিন্তু তোমাকে খুন করতেই চেয়েছিলাম। তুমি আবার চেষ্টা করো। আমার বাধা দেবার ক্ষমতা নেই। তুমি আমাকে খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দাও।

শঙ্কর বললো, আমি কোনো মানুষকেই চরম শাস্তি দিতে চাই না। অপরাধীদের শাস্তি দেবেন এখানকার সরকার কিংবা মাথার ওপরের ঈশ্বর। আমি কোনো মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ি হতে চাই না!

—তাহলে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে, শঙ্কর ?

—আমি চেষ্টা করি, যে-কোনো মানুষকেই বাঁচাতে। এমনকি সম্ভব হলে আপনার গাড়ির ড্রাইভার ও বডি গার্ডকেও আমি বাঁচাতাম। এই পাহাড়ের নিচে রয়েছে ঘন জঙ্গল। সেই জন্যই এই জায়গাটা চেয়েছিলাম। নিচে পড়ে গেলেও ওদের বাঁচার আশা আছে।

আরও কিছুক্ষণ বাদে ওরা হাঁটতে শুরু করলো। এর মধ্যে নেমে গেল বৃষ্টি।

একেবারে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে অরুণ এমনই ক্লান্ত হয়ে গেছে যে সে ভালো করে হাঁটতেই পারছে না। শঙ্কর তার হাত ধরে রইলো।

কাঠমাণ্ডুর দিকে না গিয়ে ওরা ধরলো অন্য রাস্তা। ভোরবেলা

ওরা পেঁছোলো শঙ্করের বাড়িতে।

রুমা জেগে উঠে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

শঙ্কর বললো, জল গরম করতে হবে। আমাদের দু'জনেরই গা জল-কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে।

অরুণের চোখ দিয়ে কান্নার ধারা গড়াচ্ছে। সে কাঁপা গলায় বললো, রুমা, রুমা তুই আমাকে ক্ষমা করবি?

রুমা বাবার দিকে ছুটে যাচ্ছিল, শঙ্কর হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল। গম্ভীরভাবে বললো, এক্ষুণি না, এক্ষুণি না। রুমা, তুমি তোমার বাবার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো!

অরুণ ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, তোমাদের ক্ষমা করবো, সে যোগ্যতা আমার নেই। তোমরাই আমাকে পারো তো ক্ষমা করো।

রুমা তাকিয়ে রইলো বাবার দিকে। শঙ্কর তীক্ষ্নভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো স্ত্রীকে।

মিনিট খানেক বাদে শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, রুমা, তোমার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। এবার সত্যি করে বলবে, তোমার বাবাকে দেখে যখন তুমি অজ্ঞান হয়ে যেতে, তখন ঠিক আগের মুহূর্তে কী দেখতে পেতে?

রুমা ঘোর লাগা গলায় বললো, আমি ওঁর ভেতরের মানুষটাকে দেখতে পেতাম। সে বড় ভয়ঙ্কর রূপ।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করলো, এখন সেটা দেখতে পাচ্ছো না?

রুমা বললো, না। উনি বদলে গেছেন। কিংবা, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, আমার সে চোখ নেই।

শঙ্কর হাসলো। তারপর অরুণের দিকে ফিরে বললো, আপনি আমাকে যে কাজ দিয়েছিলেন, আজ সেটা সম্পন্ন হলো। আপনার মেয়ে সেরে গেছে একেবারে।

অরুণ ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো তার মেয়েকে। দু'জনেই কাঁদতে লাগলো এক সঙ্গে।